তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

দ্বিতীয়

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গোপাধ্যায় বি. এ.

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স
আশুতোষ লাইব্রেরী
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা

১৩২৯

(প্রথম সহস্র)

দ্বিজেন্দ্রলাল
আশুতোষ লাইব্রেরী
ঢাকা ও কলিকাতা
BENGAL LIBRARY
Date 27 NOV 1922
WRITERS' BUILDINGS
CALCUTTA

তিন আনা সংস্করণের জীবনীমালা

দ্বিতীয়

দ্বিজেন্দ্রলাল

শ্রীবিনয়কুমার গাঙ্গোপাধ্যায় বি. এ.

প্রকাশক
বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স
আশুতোষ লাইব্রেরী
৩৯।১ কলেজ ষ্ট্রীট্‌, কলিকাতা

১৩২৯

(প্রথম সহস্র)

দ্বিজেন্দ্রলাল

[১]

বর্ত্তমান যুগের লোকোত্তর প্রতিভাসম্পন্ন কবিদিগের মধ্যে দ্বিজেন্দ্রলাল রায় অন্যতম। দ্বিজেন্দ্রলালকে বঙ্গের কে না জানে? সুপ্রসিদ্ধ ডি.এল. রায়ের "ধন ধান্য পুষ্পে ভরা আমাদের এই বসুন্ধরা," "বঙ্গ আমার জননী আমার," "মেবার পাহাড়" প্রভৃতি উচ্ছ্বাসময়ী গীতি-গুলি প্রতিগৃহে বালকবালিকারা পর্য্যন্ত গাহিয়া থাকে। তাঁহার চিরমধুর 'হাসির-গান' "পার তো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলায়," "বুড়োবুড়ী দুজনাতে" প্রভৃতি গীত বঙ্গের প্রতি অন্তঃপুরে পর্য্যন্ত হাসি ছড়ায়। এই হাস্যামোদী স্বদেশপ্রাণ কবি ১২৭০ সালের ৪ঠা শ্রাবণ তারিখে কৃষ্ণনগরে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহারা সাত ভাই—রাজেন্দ্র, দেবেন্দ্র, জ্ঞানেন্দ্র, নরেন্দ্র, সুরেন্দ্র, হরেন্দ্র এবং দ্বিজেন্দ্র। ইঁহাদের পিতা মহাত্মা কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ কৃষ্ণনগরের রাজা সতীশচন্দ্রের দেওয়ান ছিলেন। দেওয়ান কার্ত্তিকেয় সত্যবাদী,

জিতেন্দ্রিয় ও পরোপকারী ছিলেন বলিয়া জনসাধারণ তাঁহাকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিত। তিনি কর্ম্মজীবনে যথেষ্ট অর্থ উপার্জ্জন করিতেন; কিন্তু তাহার অধিকাংশই তিনি জনসমাজের কল্যাণার্থে নানা হিতকর কার্য্যে ব্যয় করিতেন। প্রাতঃস্মরণীয় ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র প্রভৃতি তৎকালীন মহামনস্বীগণ তাঁহার সহিত অকৃত্রিম বন্ধুতা-সূত্রে আবদ্ধ ছিলেন; তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহার বদান্যতা, অমায়িকতা, সরল স্বভাব প্রভৃতি বিবিধ সদ্‌গুণে মুগ্ধ হইয়া শতমুখে তাঁহার প্রশংসা করিতেন।

দেওয়ান কার্ত্তিকেয় তৎকালে একজন অসাধারণ সঙ্গীতজ্ঞ ও মধুর-কণ্ঠ বলিয়াও বিখ্যাত ছিলেন। তাঁহার অন্যতম সুহৃদ্ রায় দীনবন্ধু মিত্র বাহাদুর তাঁহার গুণে ও সঙ্গীতে মুগ্ধ হইয়া তৎপ্রণীত সুরধুনী কাব্যে দেওয়ান কার্ত্তিকেয়ের নিম্নলিখিত পরিচয় দিয়াছেন—

"কার্ত্তিকেয়চন্দ্র রায় অমাত্য-প্রধান,
সুন্দর সুশীল শান্ত বদান্য বিদ্বান্;
সুমধুর স্বরে গীত কিবা গান তিনি,
ইচ্ছা হয় শুনি হয়ে উজান বাহিনী।"

বঙ্গ-সাহিত্যের প্রতি কার্ত্তিকেয়ের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। এতদ্ভিন্ন তিনি ইংরেজী, পার্শি ও আর্‌বী ভাষাতেও সমধিক ব্যুৎপন্ন ছিলেন।

দ্বিজেন্দ্রলালের মাতার নাম প্রসন্নময়ী দেবী। নবদ্বীপের শ্রীমদ্ অদ্বৈতাচার্য্যের বংশোদ্ভবা এই মহীয়সী রমণী অশেষ গুণে অলঙ্কৃতা ছিলেন। ইনি অতিশয় সরল প্রকৃতি, মিষ্টভাষিণী এবং হিংসাদ্বেষাদি বির্জ্জিতা ছিলেন। এইরূপ সর্ব্বগুণান্বিত মাতাপিতার কনিষ্ঠ সন্তান

বংশোজ্জ্বলকারী দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনও মাতাপিতার ন্যায়ই সারল্য, অমায়িকতা প্রভৃতি সদ্‌গুণাবলীতে বিভূষিত হইয়াছিল।

মাতাপিতার আদরযত্নে ও ভ্রাতৃগণের স্নেহে দ্বিজেন্দ্রলালের শৈশব কাল অতি সুখে কৃষ্ণনগরে অতিবাহিত হইয়াছিল। বাল্যকালে তিনি বড়ই রোগা ছিলেন, এবং অনেকবার তিনি মারাত্মক ব্যাধিগ্রস্ত হইয়াও ভগবানের অনুগ্রহে বাঁচিয়া গিয়াছিলেন। তারপর অতি শৈশবে কয়েকটা দুর্ঘটনায়ও তাঁহাকে দুই একবার মরণাপন্ন হইতে হইয়াছিল।

বাল্যকাল হইতেই দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাব সাধারণ বালকগণের স্বভাব হইতে কতকটা স্বতন্ত্র রকমের ছিল। বালসুলভ চপলতা তাহাতে বড় একটা দেখা যাইত না। কোনও বালকের সহিত তিনি বড় মিশিতেন না। শৈশব হইতেই একটু স্বাতন্ত্র্য ভাব, একটু পাগ্‌লাটে ধরণ তাঁহাতে লক্ষিত হইত। অনেক সময়ই তিনি এক জায়গায় একলাটি বসিয়া কি যেন কি নিবিষ্ট ভাবে দেখিতেন, আর চিন্তা করিতেন।

গ্রাম্য প্রকৃতির সুন্দর নগ্ন দৃশ্যে মগ্ন হইয়া থাকার দরুণ তাঁহার স্বাভাবিক কবিত্বশক্তি বাল্যেই কতকটা বিকশিত হইয়াছিল। তরুণ বয়সেও তিনি অনেক সময় আশ্চর্য্য কবিতা রচনা করিয়া ফেলিতেন—তাহা শুনিয়া সকলে বিস্ময়ে নির্ব্বাক হইয়া যাইত। তাঁহার এই আশ্চর্য্য শক্তি দেখিয়া তাঁহার পিতা একদিন সকলের সমক্ষে বলিয়াছিলেন, "দ্বিজু আমার কালে একজন কবি হইবে।" বলা বাহুল্য, মহাত্মা কার্ত্তিকেয়ের এই ভবিষ্যদ্বাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইয়াছে। আজ বঙ্গে কে না তাঁহার মধুর গীতে মুগ্ধ!

পিতার ন্যায় দ্বিজেন্দ্রলালও অতিশয় সুকণ্ঠ ছিলেন। বাল্যকালে যখন তিনি মধুর কণ্ঠে কোন গান গাহিতেন, তখন শ্রোতারা মুগ্ধ হইয়া যাইত। বালকের সুমিষ্ট গানে মুগ্ধ হইয়া বিদ্যাসাগর, দীনবন্ধু মিত্র প্রভৃতিও তাঁহার খুব প্রশংসা করিতেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল অতিশয় সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন। এই অকৃত্রিম সরলতা তাঁহার জীবনের বিশেষত্ব ছিল বলিয়াই তিনি কপটতা, "ভণ্ডামি, জ্যেঠামি, ন্যাকামি" প্রভৃতি দেখিতে পারিতেন না, এবং চিরদিন তিনি এই সকলের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। বাল্যকাল হইতেই সাংসারিক কোন বিষয়ে তাঁহার তেমন মনোযোগ ছিল না। বেশভূষার প্রতি তাঁহার কোন দিনই বড় একটা খেয়াল ছিল না। বিলাতে থাকার সময়েও নাকি তিনি এদেশীয় পোষাকে রাস্তায় বাহির হইয়া সে দেশের লোকদের একটা দেখিবার জিনিস হইতেন।

ছয় বৎসর বয়সের সময় দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগরের এক পাঠশালায় পাঠাভ্যাসে রত হন। তাঁহার স্মরণশক্তি অতি আশ্চর্য্য রকমের ছিল। গুরু মহাশয়েরাও তাঁহার আত্মীয় স্বজনের নিকট তাঁহার প্রখর স্মৃতিশক্তির অনেক প্রশংসা করিতেন। একদিন তাঁহার বড় ভাই জ্ঞানেন্দ্র বাবু দ্বিজেন্দ্রলালকে পড়া ছাড়িয়া এদিক ওদিক ঘুরিতে দেখিয়া তাঁহাকে আট্‌কাইবার জন্য, প্রায় দুই ঘণ্টায় মুখস্থ হইবার উপযোগী ইতিহাসের পাঠ মুখস্থ করিতে বলিয়া যান। কিছুক্ষণ যাইতে না যাইতেই তিনি আসিয়া দেখেন, দ্বিজেন্দ্রলাল পড়া ছাড়িয়া আবার এদিক ওদিক ছুটাছুটি করিতেছে। ইহা দেখিয়া

জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহাকে ধম্‌কাইয়া পড়া নিয়া বসিতে বলিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল অম্লানবদনে বলিয়া ফেলিল,—আমার পড়া শিখা হইয়াছে। জ্ঞানেন্দ্র বাবু তাঁহাকে পড়া জিজ্ঞাসা করিয়া ত অবাক্! বালক ঐ সময়টুকুর মধ্যে দুই ঘণ্টার উপযোগী পাঠ সম্পূর্ণরূপে মুখস্থ করিয়া ফেলিয়াছে!

দ্বিজেন্দ্রলাল চিরদিনই অতিশয় সত্যবাদী ছিলেন। ক্লাশে ছেলেদের কোন অভিযোগাদি উপস্থিত হইলে, শিক্ষক মহাশয় তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিয়া দোষী নির্দ্দোষ নিরূপণ করিতেন। তাঁহার সহপাঠিগণও এইজন্য তাঁহাকে যথেষ্ট শ্রদ্ধা করিত। শৈশব হইতেই তাঁহার স্বাবলম্বন ছিল। যে কাজ তিনি নিজে সমাধা করিতে পারিবেন বলিয়া মনে করিতেন, তাহার জন্য কদাচ অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেন না।

বাল্যকালেই মানবের ভাবী জীবনের ছায়াপাত হয়। যাহার বাল্যকাল যে ভাবে অতিবাহিত হয়, তাহার ভবিষ্যৎ জীবনও প্রায় সেই ভাবেই গঠিত হইয়া থাকে। তাই আমরা প্রত্যেক প্রতিভাশালী ব্যক্তির বাল্যজীবনী আলোচনা করিয়া, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনের ছায়া তাহাতে দেখিতে পাই। দ্বিজেন্দ্রলালের বাল্যজীবনেও আমরা যে গুণরাশি দেখিলাম, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই গুণগুলি সবিশেষ পরিপুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

---

[২]

পাঠশালার পাঠ সমাপন করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কৃষ্ণনগর গবর্ণমেণ্ট হাই স্কুলে প্রবিষ্ট হন। তাঁহার অসামান্য মেধা শক্তি দেখিয়া, তাঁহার শিক্ষকগণ অনেক সময় আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া যাইতেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই প্রতি শ্রেণীতে সর্ব্বোচ্চ স্থানই অধিকার করিতেন। ১৮৭৮ খৃঃ অব্দে কৃতিত্বের সহিত প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া তিনি হুগলী কলেজে প্রবিষ্ট হন। তৎপর ক্রমে তিনি এফ, এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় সাধারণ ভাবেই উত্তীর্ণ হন। অবিরত ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া ভুগিয়া এই সকল পরীক্ষার সময় তিনি প্রায় আধমরা হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাই অসাধারণ প্রতিভা সত্বেও তিনি এই সকল পরীক্ষায় তত ভাল ফল করিতে পারেন নাই। কিন্তু ঐ রোগশীর্ণ অবস্থাতেও তিনি যতদূর সম্ভব নানাবিধ ইংরেজী ও সংস্কৃত পুস্তক অধ্যয়ন করিতেন। তাঁহার ইংরেজী রচনাপ্রণালী এবং ঐ ভাষায় অসামান্য অধিকার দেখিয়া, তাঁহার অধ্যাপকগণ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সবিশেষ প্রশংসা করিতেন, আর সংস্কৃত ভাষায় তাঁহার এতদূর অধিকার জন্মিয়াছিল যে, পরিষ্কার সংস্কৃতে অনর্গল বক্তৃতা দিবার অভ্যাসও তাঁহার জন্মিয়াছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রেসিডেন্সি কলেজ হইতে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে এম, এ, পরীক্ষায় ইংরেজী ভাষাতে ২য় স্থান অধিকার করেন। এই পরীক্ষা দিবার সময়ও তাঁহাকে বিষম রকমে ম্যালেরিয়ায় ভুগিতে হইয়াছিল।

বি, এ, পরীক্ষার সময় হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল সাহিত্য-সমাজে

বেশ একটু পরিচিত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বাল্যকালের রচিত কতকগুলি গীত "আর্য্যগাথা" নামে তিনি প্রকাশ করেন। এই কবিতাগুলি তিনি "১২ বৎসর হইতে ১৭ বৎসর বয়সের মধ্যে রচনা করিয়াছিলেন।" বালক-কবির এই ক্ষুদ্র কাব্যখানি অতিশয় মনোহর হওয়াতে তৎকালের মনীষিগণও ইহার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছিলেন। এই সময় হইতেই তিনি সেই সময়ের সকল শ্রেষ্ঠ সংবাদ-পত্রে প্রবন্ধ ও কবিতাদি লিখিতেন এবং সম্পাদকগণও তাঁহার প্রবন্ধাদি পাইলে অতিশয় সন্তুষ্ট হইত।

এম, এ, পাশ করিবার পরও দ্বিজেন্দ্রলালকে কিন্তু ম্যালেরিয়ায় ছাড়িল না। তাঁহার স্বাস্থ্য চিরদিনের জন্য নষ্ট হইবার মত হইয়া পড়িল। দেওঘর, বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্বাস্থ্যকর স্থানে গিয়াও তাঁহার স্বাস্থ্যের বিশেষ কিছু উন্নতি না হওয়ায়, আত্মীয় পরিজনের বাস্তবিকই কতকটা ভয় হইল। তাঁহার অগ্রজ নরেন্দ্র বাবু তখন ছাপড়া জেলার র‍্যাভেলগঞ্জে কোন স্কুলের হেড্‌মাষ্টার ছিলেন। সেইখানে গেলে দ্বিজেন্দ্রলালের স্বাস্থ্য ভাল হইতে পারে, এইরূপ মনে করিয়া, তিনি দ্বিজেন্দ্রকে তাঁহার সহিত র‍্যাভেলগঞ্জে যাইতে বলিলেন। তথায় একজন শিক্ষকের পদ খালি ছিল। ভ্রাতার কথায় দ্বিজেন্দ্রলাল সেই শিক্ষকের পদ গ্রহণ করিয়া র‍্যাভেলগঞ্জে ভ্রাতার নিকট অবস্থান করিতে থাকেন।

র‍্যাভেলগঞ্জে মাস দুই মাষ্টারি করিবার পরই গবর্ণমেণ্ট হইতে তিনি চিঠি পাইলেন যে, তিনি কৃষিবিদ্যা শিক্ষার জন্য সরকারী বৃত্তি পাইয়া বিলাত যাইতে প্রস্তুত কি না। ঐ চিঠি পাইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল আহ্লাদে

মগ্ন হইলেন। কিন্তু পিতামাতার অনুমতি পাওয়া যাইবে কি না, ইহাই তাঁহার বিষম ভাবনা হইল।

পিতা গোঁড়া হিন্দু—শুদ্ধাচারী ব্রাহ্মণ; তিনি পাশ্চাত্য সভ্যতার ততটা পক্ষপাতীও ছিলেন না। ছেলে বিলাত গেলে বিগড়াইয়া যাইবে, এটা তখনকার বৃদ্ধদের যে নেহাৎ ভুল ধারণা ছিল, তাহাও নহে। অনেকে তখন বিলাত গিয়া বাস্তবিকই বিগড়াইয়া যাইত। তা' ছাড়া বিলাত-ফেরতদিগের উপর সমাজের এত বেশী আটাআটি ছিল যে, সেই ভয়ে অনেকে বিলাত যাওয়ার কথা কল্পনার মধ্যেও আনিতে পারিত না। দ্বিজেন্দ্রলাল পিতাকে আপনার অভিলাষ ব্যক্ত করিতে প্রথমে সাহসী হইলেন না। ভ্রাতৃগণকে তাঁহাদের মতের জন্য পত্র লিখিলে, তাঁহারা সন্তুষ্ট চিত্তেই অনুমতি দিলেন। তৎপর পিতার নিকট গবর্ণমেণ্টের অনুরোধের কথা এবং নিজের অভিলাষ ও ভ্রাতৃগণের মতের কথা ব্যক্ত করিলে, তিনি প্রথমতঃ নানা অসুবিধা দেখাইতে লাগিলেন। কিন্তু ছেলের আগ্রহ দেখিয়া অবশেষে তিনি পুত্রকে বিলাত গমনে অনুমতি প্রদান করিলেন।

পিতার অনুমতি ত যা' হৌক সহজেই পাওয়া গেল; কিন্তু স্নেহময়ী জননী ত কিছুতেই তাঁহার আদরের দ্বিজুকে নিঃসহায় অবস্থায় দূরদেশে "সাত সমুদ্র তের নদীর পারে' যাইতে দিবেন না! কিন্তু এক্ষেত্রে ছেলের ভবিষ্যৎ জীবনের কল্যাণ-চিন্তাই মাতার মনকেও দৃঢ় করিল। ছেলেদের নিকট যখন শুনিলেন যে, বিলাত হইতে ফিরিলে দ্বিজেন্দ্র দেশের মধ্যে একজন গণ্যমান্য লোক হইবে,

এবং তাহার শারীরিক অসুস্থতাও দূর হইবে, তখন তিনি দ্বিজুকে বিলাত যাইবার অনুমতি দিলেন।

পিতামাতার ও ভ্রাতৃগণের শুভাশীর্ব্বাদ এবং আত্মীয় স্বজনগণের মঙ্গলেচ্ছা লইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল সেই সুদূর দেশে যাত্রা করিলেন।

---

[৩]

এইরূপে স্বদেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল আত্মোন্নতি এবং তৎসঙ্গে স্বদেশেরও হিতের জন্য প্রিয় জন্মভূমি—ততোধিক প্রিয় মাতাপিতার স্নেহময় ক্রোড় ছাড়িয়া সেই সুদূর ইংলণ্ডে চলিলেন। স্বদেশই যাঁহার 'দেবী', স্বদেশই যাঁহার চিরজীবনের 'সাধনা', স্বদেশই যাঁহার নিকট 'স্বর্গ', 'আমার দেশ' বলিতে যাঁহার হৃদয়ে 'দুঃখ, দৈন্য' থাকিত না—সেই 'স্বপ্ন দিয়ে তৈরী, স্মৃতি দিয়ে ঘেরা' 'সকল দেশের সেরা' দেশ ত্যাগ করিতে স্বদেশভক্ত দ্বিজেন্দ্রলালের হৃদয়ে যে কত কষ্ট হইয়াছিল, তাহা তিনি নিজেই জ্ঞানেন্দ্র বাবুর 'পতাকা' নামক পত্রিকায় লিখিয়াছিলেন।

লণ্ডনে আসিলে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত গিরীশচন্দ্র বসু মহাশয় পূর্ব্বেই তাঁহার আগমন সংবাদ পাইয়া, তাঁহাকে নিজ বাটীতে লইয়া গেলেন, এবং তাঁহার বাসস্থানাদি ঠিক করিয়া দিলেন। গিরীশ বাবুও কৃষিবিদ্যা শিক্ষার্থ তখন লণ্ডনে ছিলেন; তিনিই দ্বিজেন্দ্রকে তাঁহাদের অধ্যক্ষের সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

লণ্ডনে থাকার সময়ে দ্বিজেন্দ্রলাল লাইরিক্‌স্ অব্ ইণ্ড্ (Lyrics of Ind) নামে একখানি ইংরেজী কাব্য রচনা করিয়া তদীয় বন্ধুবর্গকে উপহার দেন। ইংরেজী কবিতা লিখার আগ্রহ দ্বিজেন্দ্রলালের পূর্ব্ব হইতেই ছিল। কিন্তু ইহা ছাড়া আর কোন ইংরেজী কবিতা তিনি প্রকাশ করেন নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি সাধনে কৃতসংকল্প না হইয়া, বিদেশীয় ভাষার অনুশীলন করা বড়ই অন্যায়। সঙ্গে সঙ্গে বোধ হয় প্রসিদ্ধ কবি মাইকেলের কথাও তাঁহার মনে পড়িয়াছিল। বাঙ্গালার ভাগ্যগুণে তিনি অতঃপর মাতৃভাষার শ্রীবৃদ্ধি কল্পেই বদ্ধপরিকর হয়েন।

দ্বিজেন্দ্রলাল ইংলণ্ডবাসিদের পরিচ্ছন্নতা, সময়ানুবর্ত্তিতা কার্য্যনিপুণতা, পরিশ্রমতৎপরতা, ভদ্রব্যবহার প্রভৃতি গুণাবলির যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, 'এখানকার প্রথম দ্রষ্টব্য বিষয় পরিচ্ছন্নতা। নিতান্ত গরীবের বাড়ী যাও, দেখিবে বাড়ীর সামান্য প্রাঙ্গণ পরিষ্কার। বাটীর মধ্যেও যাহা আছে, তাহা বেশ সুনিয়মে ও সুশৃঙ্খলে অবস্থিত। ঘরের মধ্যে যাও, আশ্চর্য্য শৃঙ্খলা দেখিবে। যথাস্থানে টেবিল, চেয়ার, বাসন, পুস্তক সজ্জিত দেখিলে চক্ষু জুড়ায়। গরীব পরিবারের যাহা পরিধেয় বসন আছে, তাহা পরিষ্কার। আমাদের দেশে দশ হাজার টাকা আয়ের ধনী জমিদার যেরূপ থাকেন, এখানে এক হাজার টাকার গরীবও বোধ হয় তদপেক্ষা অনেক বেশী স্বচ্ছন্দতায় বাস করে। আমাদের দেশীয় যে দোকানে যাও, কোথাও বেশ সৌন্দর্য্য ও পরিচ্ছন্নতা দেখিবে না। কিন্তু এখানে পুরবাসীর বাসগৃহ যেরূপ পরিষ্কার দেখিবে, প্রতি দোকানও সেইরূপ

সুন্দর, পরিষ্কার, সুসজ্জিত দেখিতে পাইবে। রাস্তার দুইধারে সুন্দর নয়ন মনোরঞ্জক, নেত্রাকর্ষী বিবিধ বিপণী দেখিতে পাইবে। দোকান-গুলির প্রায় সকলেরই সম্মুখের আবরণ একখানি সুদীর্ঘ সুপ্রশস্ত কাচ। এতবড় একখানি অখণ্ড কাচ আমি বঙ্গদেশে কখনও দেখি নাই। এই বিষয় হইতে এরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে যে, ইংরেজ বালকগণ খুব ধীর ও শান্ত। এখানে দাম লইয়া বিক্রেতার সহিত বাদানুবাদ করিতে হয় না। দোকানদারেরা খুব সম্মানময়। তুমি দাম দিলে, Thank you, Sir, বলিয়া তোমাকে বিদায় দিবে। তুমি যদি জিনিস হাতে করিয়া লইয়া যাইতে না চাও, তোমার নাম ধাম লিখিয়া দাও, বিক্রেতা জিনিস পাঠাইয়া দিবে, প্রেরণের জন্য কিছু অর্থও চাহিবে না। এখানে দোকানদারের সাধুতা ও সত্যপরায়ণতার দিকে বিশেষ লক্ষ্য। তুমি যাহা ফরমায়েস দিতে চাও, দিয়া যাও; টাকা দিয়া যাও বা না-ই যাও, নামধামাদি লিখিয়া দিয়া গেলে, যথা-স্থানে ক্রীত দ্রব্য প্রেরিত হইবে।

'চাকরাণী তোমার সব কাজ করিবে—জুতা পরিষ্কার হইতে বাসন মাজা পর্য্যন্ত। চাকরাণী তোমার প্রতি সম্মানপূর্ণা। তাহাকে তোমার কোন কাজের জন্য ধমকাইতে হইবে না। আমাদের দেশে চারি পাঁচটা চাকর চাকরাণী রাখিয়াও যেন কাজই কুলাইয়া উঠে না। এদেশে নীরবে, সসম্মানে, সন্তোষকর ভাবে সব আজ্ঞা পরিচারিকা বহন করে।

'পথে উচ্চৈঃস্বরে কথা কহা এখানে ঘোর অসভ্যতা। পথে অতি আস্তে কথা কহিতে হইবে, নতুবা উন্মাদাগারে নীত হইবার

খুবই সম্ভাবনা; অন্ততঃ লোকে মনে করিবে, তাহাই তোমার যোগ্যতর বাসস্থান। পথে চুরুট খাওয়াও অভদ্রতা।'

ইংরেজ জাতির,—শুধু ইংরেজ জাতির নহে, বর্ত্তমান কালের সমুদায় উন্নতিশীল সভ্যজাতির এই যে আরামে থাকিবার ইচ্ছা ও শিক্ষা, এটা তাহাদের অসন্তোষ হইতে উৎপন্ন বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস ছিল। বাস্তবিক কথাটা খুবই ঠিক। তুমি যদি নিজের অবস্থায় সুখী থাক, তবে ঐ অবস্থাকে আরও উন্নত করিতে তোমার ইচ্ছা কখনই হইবে না; এবং তোমার সারাজীবনটা একভাবেই কাটিয়া যাইবে। 'কি রাজনৈতিক, কি সামাজিক, কি পারিবারিক—সকলের মূলেই এই অসন্তোষ। "অসন্তোষই ফরাসীবিপ্লব করিয়াছিল, অসন্তোষই বৃটিশ জাতিকে রাজার নিকট হইতে স্বত্ব কাড়িয়া দিয়াছে; অসন্তোষই আবার ভারতীয়গণকে নূতন জাতি করিতে সক্ষম।" যত দিন আমাদের দেশবাসীর ভাল আবাস গৃহে আরামে থাকিতে ইচ্ছা না হইবে, ততদিন আমাদের গার্হস্থ্য অবস্থার উন্নতি হইবে না। আগে শৃঙ্খলাময় পরিচ্ছন্ন বাসগৃহে বাস করিতে তাহাদিগের বলবতী বাসনার উদ্রেক করান আবশ্যক, পরে বাসনা পূর্ণ করিবার প্রয়াস হইবে, অবস্থা উন্নত করিবার ইচ্ছা হইবে।'

নিজেদের অবস্থায় সন্তুষ্টি না আনিয়া অবস্থা উন্নত কর, কিন্তু বিলাসী হইও না—ইহাই তাঁহার উপদেশ ছিল। তাই তিনি পুনঃ পুনঃ বিলাসিতা পরিবর্জ্জন করিতে সাবধান করিয়াছেন। 'বিলাস মনুষ্যের বা জাতির পতনের মূল। রোমের পতন এই বিলাসে, ভারতের অবনতিও এই বিলাসে। কিন্তু সম্ভোগবাসনা বিলাস নহে।

বাসনা কার্য্যময়, বিলাস অকর্ম্মণ্য। কেহ এক শত টাকাতে বিলাসী হইয়া পড়েন; কেহ আবার হাজার টাকায়ও সন্তুষ্ট হইতে পারেন না, অতএব বিলাসীও হইতে পারেন না। অসন্তোষ বিলাসী নহে।' কাজেই তাঁহার উপদেশ ছিল, নিজের অবস্থা উন্নত হইতে উন্নততর করিতে চেষ্টা কর, কিন্তু সাবধান বিলাসী হইও না;—তাহা হইলে অধঃপাতে যাইবে।

লণ্ডনে একটী পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল বাস করিতেছিলেন। সেই পরিবারের গৃহকর্ত্রী দ্বিজেন্দ্রলালকে তাঁহার সরল স্বভাবের জন্য খুব বেশী ভালবাসিতেন। সেখানে থাকিতে তিনি প্রায়ই সেখানকার বড় বড় নাট্যশালায় নানাবিধ নাটকাদি দর্শন করিয়া রঙ্গালয়ের বিষয়ে অনেক তথ্য ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে তাঁহার রঙ্গালয়ের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ জন্মে। আমরা তাঁহার অনেক গানের মধ্যে যে বিলাতি ঢংএর সুর এবং কোরাস্ আদি দেখিতে পাই, ইহা বোধ হয় তাঁহার বিলাতী রঙ্গালয়ের প্রতি আকর্ষণ এবং বিলাতে সঙ্গীত-চর্চ্চার ফল।

বিলাতে অবস্থান কালে ১২৯২ সালে হঠাৎ তিনি সংবাদ পাইলেন, তাঁহার পিতা পরলোক গমন করিয়াছেন। পিতৃভক্ত দ্বিজেন্দ্রলাল এই শোচনীয় সংবাদে একেবারে মর্ম্মাহত হইয়া পড়িলেন। তিনি প্রায় একমাস কাল একেবারে দেহছাড়া হইয়া রহিলেন—কাহারও সহিত ভালমত কথাও বলিতেন না।

কিন্তু প্রবাসে তিনি কেবল পিতৃবিয়োগের দুঃসংবাদই শুনিলেন

না। ১৮৮৬ খৃষ্টাব্দে কৃষিবিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া F. R. A S. উপাধি প্রাপ্ত হইলেন এবং তৎসঙ্গে তিনি বিলাতের রাজকীয় কৃষি-কলেজ ও রাজকীয় কৃষি-সমিতির সদস্য নির্ব্বাচিত হইয়া M. R A. C. ও M. R. S. A. E উপাধি প্রাপ্ত হইলেন। বিলাতের শিক্ষা এইরূপে পরিসমাপ্ত করিয়া যখন তিনি স্বদেশে ফিরিয়া আসিবার উদ্যোগ করিতেছিলেন, সেই সময় দ্বিজেন্দ্রলালের স্নেহময়ী জননীও অমরধামে প্রস্থান করিলেন। যথাকালে এই দুঃসংবাদ দ্বিজেন্দ্রের গৃহকর্ত্রীকে জানান হইল। গৃহকর্ত্রীর দ্বিজেন্দ্রের পিতৃবিয়োগকালের কথা স্মরণ পড়িল। মাতৃবিয়োগের কথা শুনিলে যে তাঁহার হৃদয় একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে, তিনি যে একেবারে উন্মত্তের মত হইবেন, ইহা গৃহকর্ত্রী নিশ্চয়রূপেই জানিতেন। তাই তিনি দ্বিজেন্দ্রকে মাতার মৃত্যু সংবাদ না দিয়া কেবল বলিলেন যে, "তোমার মাতাঠাকুরাণী কঠিন পীড়ায় শয্যাগত; তোমার সত্বরই রওয়ানা হওয়া কর্ত্তব্য।" মাতৃগত-প্রাণ দ্বিজেন্দ্র এই সংবাদ শুনিয়াই উন্মত্তের মত হইয়া পড়িলেন, এবং পরবর্ত্তী জাহাজেই বাটী অভিমুখে যাত্রা করিলেন। দেশে ফিরিবার পথে জনৈক বন্ধু তাঁহাকে জাহাজে এই দুঃসংবাদ জ্ঞাপন করিলে দ্বিজেন্দ্রলাল শোকে অস্থির হইয়া পড়িলেন।

এইরূপে প্রবাসের শেষভাগে পিতামাতার প্রিয়তম কনিষ্ঠ সন্তান দ্বিজেন্দ্রলাল পিতামাতাকে হারাইয়া শোকে দুঃখে জর্জ্জরিত হইয়া জন্মভূমিতে ফিরিয়া আসিলেন।

মাতৃগত-প্রাণ দ্বিজেন্দ্রলালের মায়ের প্রতি কিরূপ অগাধ ভক্তি ছিল, তদীয় নাটকাদিতে তাহা স্পষ্টরূপে ব্যক্ত। মাকে তিনি

চিরকালেই দেবীর মত মনে করিতেন—সেই দেবী যেন এ মরভূমির কেউ নয়, যেন পৃথিবীস্থ মানবের হিতকল্পে ভগবতী স্বয়ংই মাতৃরূপে গৃহে গৃহে বিরাজ করিতেছেন। মাতৃস্নেহ যেন ঈশ্বরের দান—'অমৃত সমুদ্র'! "এই মানবজীবনের তপ্ত সৈকতে এই মাতৃস্নেহের অমৃত-সমুদ্র উচ্ছ্বলিত হয়ে যাচ্ছে।—মানুষ স্নান কর, পান কর, পবিত্র হও।"

আর এই মাকে যে ভক্তির চক্ষে না দেখে—যে অবহেলা করে সে পৃথিবীতে সব রকম দুষ্কার্য্যই করিতে পারে। তিনি 'পরপারে' নাটকে মাতৃহীনা সরযূর মুখ দিয়া মাতার প্রতি উদাসীন স্বামী মহিমকে বলাইতেছেন,—"তুমি কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারো জানি না, যখন মায়ের প্রতি তোমার টান নেই। মাতৃভক্তি—যে কর্ত্তব্য সর্ব্ব কর্ত্তব্যের মূল; জীবনে মহাশিক্ষা, মনুষ্য-প্রকৃতির মজ্জাগত সনাতন ধর্ম্ম...যা একটা স্বর্গীয় প্রতিভায় মানবজীবনকে মণ্ডিত করে···আর মৃত্যুর সেই ভয়ানক মুহূর্ত্ত আলোকিত করে;—যে এই মাতৃভক্তির কাঙ্গাল, তার আর কি আছে! সে জীবনে কি পাপ কাজ না কর্ত্তে পারে! তাই বল্‌ছিলাম—সাবধান! সংসারে মায়ের বাড়া কেউ নেই—ভগ্নী নয়, কন্যা নয়, স্ত্রী নয়।—"

এত যাঁর মাতৃভক্তি, মায়ের শোক তাঁর বুকে কি রকম বাজিয়াছিল, তা' সহজেই বুঝা যায়!

---

[৪]

এইরূপে পিতৃমাতৃহারা হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল স্বদেশে ফিরিয়া আসিলেন। কিন্তু তাঁহার স্বাধীন স্বভাবের ফলে তিনি অন্য কোন বড় পদ না পাইয়া ডেপুটী ম্যাজিষ্ট্রেটের পদ পাইলেন। বিলাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তিনি স্বদেশবাসী দ্বারা সম্মানের সহিত অভ্যর্থিত হইলেও, বিলাত-ফেরত বলিয়া সমাজ তাঁহার প্রতি বড়ই আটাআটি করিতে লাগিল। তদীয় আত্মীয়গণ তাঁহাকে বিলাত-ফেরত বলিয়া সমাজে বর্জ্জন করিতে এবং তৎসঙ্গে একত্র আহারাদি করিতে অস্বীকার করিল। কেহ কেহ তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিয়া সমাজে উঠিবার উপদেশ দিল। দ্বিজেন্দ্রলাল কর্ত্তব্য কাজ সাধনে বিলাত গিয়া কি যে এমন অন্যায় পাপকার্য্য করিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলেন না। বিশেষতঃ তিনি ত বিলাতে নানা প্রলোভন উপেক্ষা করিয়া অতিশয় সংযতভাবে নির্ম্মল জীবনই যাপন করিয়াছেন! তবু কেন তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে! সমাজে যাহারা নানারূপ পাপকার্য্য—'দিবারাতি দুপুরে ডাকাতি' করিয়া, 'উদার স্বভাব' বশে 'গোপনে' 'নিষিদ্ধ পক্ষিমাংসাদি' উদরস্থ এবং আরও অনেক প্রকার ঘৃণিত কাজ করে, কৈ সমাজ ত তাঁহাদিগকে কিছুই বলে না। আর শিক্ষার জন্য বিদেশে গেলেই যত দোষ! মনুও ত যথাতথা হইতে শিক্ষালাভ করিতে উপদেশ দিয়াছেন! সেই ধর্ম্মশাস্ত্রকারের অবমাননা করিয়াও সমাজ এরূপ দৌরাত্ম্য করিবে—দ্বিজেন্দ্রের ইহা অসহ্য হইল। তিনি প্রায়শ্চিত্ত করিতে একেবারে অস্বীকার করিলেন।

শেষে একজন সমাজের নেতা গোপনে কিছু টাকা লইয়া তাঁহাকে সমাজে উঠাইতে স্বীকৃত হইলেন। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রের ভ্রাতৃগণ এই ঘৃণিত প্রস্তাবে সম্মত হওয়া ত দূরের কথা, দ্বিজেনকে প্রায়শ্চিত্ত করিতেও আর উৎসাহিত করিলেন না। দ্বিজেন্দ্রলাল ত প্রায়শ্চিত্ত করিতে কখনই প্রস্তুত ছিলেন না। কাজেই তিনি সমাজ-পরিত্যক্ত—'একঘরে' হইলেন।

ক্ষোভে এবং রোষে হিন্দু-সমাজের উপর ভয়ানক আক্রোশভরে এবার তিনি হিন্দুসমাজকে ভীষণ ভাবে আক্রমণ করিলেন। সেই আক্রমণের ফল—'একঘরে'। অন্যায়রূপে অত্যাচারিত হইলে অন্যায়-বিদ্বেষী দ্বিজেন্দ্রলাল কোন দিন ভাষাকে সংযত রাখিতে পারেন নাই—বিশেষতঃ তাঁহার নূতন বয়সে, নবীন জীবনে। কাজেই ইহার ভাষা বড়ই কঠোর এবং শ্লেষপূর্ণ। সমাজের উপর ভয়ঙ্করভাবে ক্রুদ্ধ হইয়া দ্বিজেন্দ্রলাল এই পুস্তকখানি লিখিয়াছিলেন বলিয়া, তিনি বহুস্থলে অশুচিতভাবে হিন্দু-সমাজকে আক্রমণ করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার মূল বক্তব্যটা যে সত্য, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, দ্বিজেন্দ্রলাল আজীবন সত্যপ্রিয় ছিলেন। সত্য ও সরলতাই ছিল তাঁহার জীবনের প্রধানতম বিশিষ্টতা। এই সত্যনিষ্ঠা ও সরল প্রকৃতির বলে তিনি সমাজে যাহা কিছু খারাপ—যাহা কিছু কদর্য্য দেখিতেন, লোকমত অগ্রাহ্য করিয়া তাহাতেই তিনি তীব্রভাবে কষাঘাত করিতে বিন্দুমাত্রও দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিতেন না।

সমাজের কয়েকজন তথাকথিত সঙ্কীর্ণচেতা অপদেবতাদের আর কোন কাজ কর্ম্ম নাই —এই দলাদলি নিয়াই তাহাদের জীবনটা বেশ

আয়াসে কাটিয়া যায়। অথচ নিজেরা সমাজে থাকিয়াও অসংখ্য কুকর্ম্ম করিয়া "ভণ্ডামীর কুসুম দিয়া, জুয়াচুরির মন্ত্র পড়িয়া, নীচাশয়তার মন্দিরে, মিথ্যার স্বর্ণপ্রতিমা গড়াইয়া পূজা" করিয়া বেশ্ রকমে সমাজপতি সাজিয়া সমাজ শাসন করিয়া থাকেন। একদল ভণ্ড সামাজিকের আবার এই দলাদলিই উদরপূর্ত্তির একমাত্র বৃত্তি। দ্বিজেন্দ্রলাল "একঘরেতে" তীব্র বিষের জ্বালা তাহাদের উপরই ছড়াইয়াছেন এবং নিজেই লক্ষ্য করিয়াছেন যে "এই ক্ষুদ্র পুস্তকখানি সমাজের কিঞ্চিৎ উপকার করিয়াছে।"

এই দলাদলি বিষয়ে তিনি বিলাত থাকিতে লিখিয়াছিলেন,—"সমাজ আমাকে ত্যাগ করিবে? সমাজ কি আমাকে ত্যাগ করিয়া হীনবল হইল না? অবশ্যই প্রথমে আমারই ক্ষতি অধিক, কিন্তু পরিণামে সমাজেরই ক্ষতি।" আবার এই সময়েও লিখিয়াছেন,—"এক কথা বলিয়া দিই। বিলাতফের্ত্তারা মূর্খ হইলেও তাহাদের একঘরে করিয়া আপনাদের সমাজ বলবান্ হইবে না। কোন জাতি কোন কালে নিজের মধ্যে বিচ্ছেদের নীতি অবলম্বন করিয়া বড় হয় নাই। বরং সম্মিলনের নীতিতেই বড় হইয়াছিল।"

বাস্তবিক একটু ভাবিয়া দেখিলে কথাগুলি যে কত সত্য, তাহা বুঝা যায়। এই 'দলাদলি' 'রেষারেষিতে' যে সমাজ কত দুর্ব্বল, কত হীন, কত অধঃপতিত হইয়া পড়িয়াছে, তাহা সকলেই জানেন। সুযোগ পাইলেই তিনি এই গৃহবিবাদের এবং তার অবশ্যম্ভাবী ফলের উল্লেখ করিয়াছেন। 'একঘরেতে' লিখিয়াছেন,—"গ্রীস এই গৃহবিবাদে ডুবিল, ভারত এই গৃহবিবাদে উচ্ছন্ন হইল; ...জাতিতে কেন

পৃথিবীর চারিদিকেই সংযোগই—উন্নতি, বল, সভ্যতা, জীবন।…যে গৃহাহ বিবাদ পূর্ব্বে রাজায় রাজায় ছিল, তাহা আজ ভ্রাতায় ভ্রাতায় পরিণত হইয়াছে।" 'মেবার পতনে' মহাবৎ বলিতেছেন,—"এত বিদ্বেষ! এত আক্রোশ! আশ্চর্য্য নয় যে এজাতি বারবার মুসলমানের পদদলিত হয়েছে! মুসলমানধর্ম্ম আর যাই হোক, তার এ মহত্বটুকু আছে, যে, সে যে কোন বিধর্ম্মীকে নিজের বুকে করে আপনার করে নিতে পারে। আর হিন্দুধর্ম্ম?—একজন বিধর্ম্মী শত তপস্যায় হিন্দু হতে পারে না। ‥একমুহূর্ত্তের জন্য ভুলে যাও যে তুমি হিন্দু, আমি মুসলমান। শুদ্ধ মনে কর যে তুমি মানুষ আমি মানুষ, তুমি ভগ্নী আমি ভাই।" মেবারের পতনকাল সম্বন্ধে সত্যবতী কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিতা হইয়া মানসী বলিতেছেন,—"যে দিন থেকে সে নিজের চোখ বেঁধে আচারের হাত ধরে চলেছে। সেই উদার—অতি উদার হিন্দুধর্ম্ম—আজ প্রাণহীন একখানি আচারের কঙ্কাল।" 'প্রতাপসিংহে' মানসিংহ বলিতেছেন,—"স্বাধীনতা মহারাজ? জাতীয় জীবন থাক্‌লে তবে তো স্বাধীনতা! দ্রাবিড়ের ব্রাহ্মণ বারাণসীর ব্রাহ্মণের সঙ্গে খায় না; সমুদ্র পার হলে জাত যায়; জাতির প্রাণ যে ধর্ম্ম, তা' আজ লৌকিক আচার মাত্র;—এসব জাতীয় জীবনের লক্ষণ নয়।"

এই 'একঘরেতে' প্রধানতঃ তিনি যে মত পোষণ করিতেন, উত্তরকালেও সেই দলাদলি সম্বন্ধীয় মত তাঁহার একেবারেই বদলায় নাই—তবে আনুষঙ্গিক অন্যান্য মতগুলি অবশ্যই শেষটায় আর ছিল না। যাহা তিনি তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিয়া সত্য বলিয়া ধরিতেন, তাহা কিছুতেই ছাড়িতেন না। তিনি বুঝিয়াছিলেন—এই

দলাদলিটা একটা সামাজিক অনিষ্টের হেতু—তাই ২৭ বৎসর পরেও আবার 'একঘরে' পুনর্মুদ্রণ করেন। তাঁহার শেষ বয়সের লেখা "বঙ্গনারীতে"ও তিনি দেবেন্দ্রকে দিয়া বলাইতেছেন,—"যদি ওর (সদানন্দের) ছেলের সঙ্গে আমার মেয়ের বিয়ে দেওয়া সম্ভব হত! না—সমাজের কাছে ও যে পরম অপরাধী। বিলেত-ফেরত! চুরি কর, জাল কর—সমাজ সব সৈবে; কিন্তু বিলেত যাত্রা অমার্জ্জনীয়।" আবার অন্য স্থলে দেবেন্দ্র বলিতেছে,—"যেখানে বিদ্যাসাগর, রাম-মোহন, কেশব সেন, রামতনু লাহিড়ী একঘরে, সেখানে একঘরে হওয়ায় লজ্জা নাই। সমাজ একঘরে কচ্ছেন কাকে? যাঁর হৃদয় বালিকা বিধবার জন্য কাঁদে, যে অর্থাভাবে কন্যার বিবাহ দেয় না, যার স্ত্রী না খেতে পেয়ে রাস্তায় বেরোয়, যে বিদ্যাশিক্ষার্থে বিলাত যায়, তাকে সমাজ একঘরে কচ্ছেন; আর যে লম্পট, ব্যভিচারী, জালিয়াৎ, চোর, স্ত্রীঘাতক—যে তিনবার জেল খেটে এসেছে,—যে শত নিরীহ প্রজার ঘর পুড়িয়ে, কি সরিকের ভিটেয় ঘুঘু চড়িয়ে, হত্যায় হাত দুখানি রাঙ্গিয়ে এসে, সেই হাতের বুড়ো আঙ্গুলে টাকা ঘুরিয়ে উঁচু দিকে ফেলে দিতে পারে, এই সনাতন সমাজ তার মাথার উপর হাত বোলায়। বিদ্যাসাগর হলেন একঘরে—আর মোহান্ত হলেন পরম ধার্ম্মিক!"

অন্যান্য স্থলেও তিনি ভণ্ড-সামাজিক ও দলাদলির তীব্র ব্যঙ্গ করিয়াছেন—উদাহরণ স্বরূপ 'আষাঢ়ে'র "শ্রীহরি গোস্বামী", "রাজা নবকৃষ্ণ রায়ের সমস্যায়" শ্রীল গোবিন্দ গোস্বামীর সময় কর্ত্তন, 'হাসির গানে'—

"শাস্ত্র ভুলে রেখে শুধু আর্কফলা শিরে—
দলাদলি করে শুধু রাখ্‌বে সমাজটীরে ?
তা' সে হবে কেন ?"

তাই তাঁহার উপদেশ—

"ছেড়ে দলাদলি,
কর গলাগলি।
ছেড়ে রেষারেষি,
কর মেশামেশি।"

যদি কেহ বিলাত থেকে ফিরিয়া আসিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিত, তবে তিনি মনে করিতেন যে, বিলাত গিয়া সে নিশ্চয়ই কোন দোষ করিয়াছে, নচেৎ প্রায়শ্চিত্ত করা কেন ? কাজেই বিলাতফের্ত্তাদের প্রায়শ্চিত্ত করার জন্যও ব্যঙ্গ করিয়া লিখিয়াছেন,—

"কোর্ত্তে 'একঘরে'র মস্ত বন্দোবস্ত ব্যস্ত কোন ভায়া ;
তখন আমি হাসি জোরে, গুম্ফ ভ'রে ছেড়ে প্রাণের মায়া।
যবে কেউ বিলেত থেকে ফিরে বেঁকে প্রায়শ্চিত্ত করে ;
যবে কেউ মতিভ্রান্ত ভেড়াকান্ত ধর্ম্ম ভাঙ্গে' গড়ে' ;
যবে কেউ প্রবীণ ভণ্ড, মহাষণ্ড পরেন হরির মালা,
তখন ভাই নাহি ক্ষেপে, হাসি চেপে রাখ্‌তে পারে কোন্—"

এইরূপ সঙ্কীর্ণতা দলাদলি যে আমাদের জাতীয় অধঃপতনের জন্য কতদূর দায়ী, ইহাতে যে জাতীয় ভাবের কতদূর অধোগতি হইয়াছে, এবং এই ভাব ত্যাগ করিলে জাতি যে কত বলবান, কত

কর্ম্মক্ষম হয়, তাহা এই হিন্দুমুসলমানের পবিত্র জাতীয় মিলনের দিনে সকলেই প্রণিধান করিতেছেন।

---

(৫)

বিলাতের জলবায়ুর গুণেই হোক, বা উহার আচার ব্যবহারের আকর্ষণী শক্তিতেই হউক, বিলাত হইতে ফিরিলে প্রায় সকলেই বিলাতের আদব কায়দা, হ্যাট কোট টুপী প্রভৃতির বড়ই ভক্ত হইয়া পড়েন। তবে কাহারও কাহারও সেই আচার ব্যবহার মজ্জাগত হইয়া যায়—চিরজীবনই তাঁহারা 'ময়ূরপুচ্ছধারী কাক' থাকিয়া যান—আবার কেহ কেহ বা পাশ্চাত্য পোষাকের মায়া কাটাইয়া আবার সেই সনাতন ধুতিচাদর গ্রহণ করেন, (অবশ্যই কর্ম্মকালে চাকুরীর বা ব্যবসার দায়ে যাঁহারা পাশ্চাত্য পোষাক ব্যবহার করিতে বাধ্য হন, তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র)। আমাদের দ্বিজেন্দ্রলাল এই শেষোক্ত শ্রেণীর লোক। বিলাত হইতে ফিরিয়া আসিয়া বিশেষতঃ সমাজ তাঁহাকে একঘরে করিলে, তিনি একেবারে পুরাদস্তর সাহেব হইয়া পড়িলেন। সর্ব্বদা হ্যাট কোট নেকটাই—বিলাতী ভাব, বিলাতী চলাফেরা, মুখে বিলাতী গান! এমন কি, নামটাতে পর্য্যন্ত বিলাতী ঢং—মিঃ দুইজেন লালা রে (Mr. Dwijen Lala Ray ওরফে Mr. D. L. Ray.) তখন হইতেই তিনি শেষোক্ত নামে পরিচিত হইয়া গেলেন। এখনও দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের থেকে ডি. এল্. রায় নামেই তিনি বেশী পরিচিত। এই নামের বিকৃতিটাও তাঁহার সেই সময়কার

সাহেবি চালচলনের ফল! কিন্তু কিছু দিন পরেই তাঁহার এই মোহ কাটিয়া গেল—কেবল মোহই কাটিল না ; যখন তিনি বুঝিলেন যে এই সাহেবি ঢং আমাদের সমাজের পক্ষে প্রভূত অহিতকারী, তখনই তিনি ইহা চিরজীবনের জন্য ত্যাগ করিলেন—বাড়ীতে হ্যাট কোট পড়া, গোসলখানায় যাওয়া বন্ধ হইয়া গেল। তিনি এই বিজাতীয় পোষাকের প্রতি এতদূর বিদ্বিষ্ট হইয়াছিলেন যে, কিছুকাল পরে নিজেই নিজের তথা সাহেবিভাবাপন্ন অন্যান্য বিলাতফের্ত্তাদের সাহেবিয়ানার নিন্দা করিয়া লিখিলেন—

"আমরা বিলাতফের্ত্তা ক' ভাই,
আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি নাচার স্বদেশী আচার
করিয়াছি সব জবাই।

"রাম" "কালিপদ" "হরিচরণ"
নাম এসব সেকেলে ধরণ
তাই নিজেদের সব "ডে" "রে" ও "মিটার"
করিয়াছি নামকরণ।

আমরা ছেড়েছি টিকির আদর
আমরা ছেড়েছি ধুতি ও চাদর
আমরা হ্যাট বুট আর প্যাণ্ট কোট প'রে
সেজেছি বিলাতি বাঁদর। ইত্যাদি।

বাস্তবিকই প্রথম জীবনে 'হাসির গানে' বর্ণিত বিলাতফের্ত্তার প্রথম কয়েকটা দোষ তাঁহার নিজেরই ঘটিয়াছিল। /

যখন তিনি পুরাদমে সাহেব, তখন কলিকাতার বিখ্যাত হোমিও-প্যাথ প্রতাপচন্দ্র মজুমদারের কন্যা সুরবালা দেবীকে দর্শন করিয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে আন্তরিক ইচ্ছা প্রকাশ করেন। প্রতাপবাবু আহ্লাদের সহিত তাহাতে সম্মত হইলেন; কিন্তু তিনি হিন্দু মতে বিবাহ দিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি মনে করিয়াছিলেন, বিলাতফেরত দ্বিজেন্দ্র—যে 'একঘরে'র মত পুস্তিকা লিখিয়াছে—সে কিছুতেই হিন্দুমতে বিবাহ করিবে না। কিন্তু তিনি আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া শুনিলেন যে, ইতিপূর্ব্বে শুদ্ধ এই হিন্দুমতে বিবাহ দিতে সম্মত না হওয়ায়ই দুই একজন কন্যার পিতাকে দ্বিজেন্দ্রলাল ফিরাইয়া দিয়াছেন। যাহা হউক, ১২৯৪ সালের বৈশাখ মাসে শুভলগ্নে দ্বিজেন্দ্র-লালের সহিত সুরবালা দেবীর শুভোদ্বাহ মহা ধুমধামে প্রতাপ মজুমদার মহাশয়ের তৎকালীন বাসাবাটীতে সম্পন্ন হইল। এই বিবাহে দ্বিজেন্দ্রলাল একপয়সাও পণগ্রহণ করেন নাই। তদীয় বিবাহে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃগণ এবং আত্মীয় স্বজন এবং কলিকাতার অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন। কয়েকজন বন্ধুবান্ধবও তাঁহার বিবাহে যোগদান করিতে ইচ্ছুক হইয়াছিল; কিন্তু সমাজশাসনের ভয়ে তাহারা আর অগ্রসর হয় নাই।

। বিবাহের কিছুদিন পরে দ্বিজেন্দ্রলাল Director of Agriculture এর অধীনে এক উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া কার্য্যোপলক্ষে মুঙ্গেরে বাস করিতে থাকেন। এই সময়ে তিনি আর্য্যগাথা ২য় ভাগ

প্রকাশ করেন এবং 'হাসির গানের' ও 'আষাঢ়ের' অধিকাংশ গীত এবং কবিতাগুলি তিনি এই সময়ে—"জীবনের এই সুখময় অবসরে" রচনা করেন। কেবল ইহাই নহে, মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালেই তিনি ওস্তাদের সাহায্যে নিয়মমত সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন করিতে থাকেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বরাবরই কিছু স্বাধীনচেতা ও একগুঁয়ে মেজাজের লোক ছিলেন। ইহা তাঁহার সরল হৃদয়ের সরল বিশ্বাস এবং "নিষ্পাপ শুভ্র, লঘুস্বচ্ছ" জীবনের অবশ্যম্ভাবী ফল। এই স্বাধীন মেজাজ তাঁহার কর্ম্মজীবনে কতকটা কণ্টকস্বরূপ হইয়াছিল। তিনি অতিশয় পরিশ্রমী ছিলেন এবং সকল কাজই অতি শৃঙ্খলার সহিত নির্ব্বাহ করিতেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি, সত্য এবং স্পষ্টবাদিতা ও একনিষ্ঠাই ছিল তাঁহার কর্ম্মজীবনের একমাত্র সহায়—যাহার বলে তিনি কর্ম্মজীবনে অনেক প্রতিকূল অবস্থা হইতে অনায়াসে জয়ী হইয়া বাহির হইয়াছেন। দুর্ব্বলের প্রতি অত্যাচার ও নিঃসহায় ব্যক্তিদের প্রতি অযথা অন্যায় আচরণ তিনি সহ্য করিতে পারিতেন না। তাঁহার কার্য্যনিপুণতা ও শৃঙ্খলায় তাঁহার উপরিস্থ রাজপুরুষগণ সন্তুষ্ট থাকিতেন এবং তাঁহার অমায়িক ও মধুর ব্যবহারে ও কথাবার্ত্তায় তাঁহার নিম্নতন কর্ম্মচারীবৃন্দ তাঁহাকে ভক্তির চক্ষে দেখিতেন। তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক অনেক যায়গায় জরীপের জন্য প্রেরিত হইতেন এবং সর্ব্বত্রই অতিশয় সুখ্যাতির সহিত সুশৃঙ্খলভাবে কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেন।

জরীপাদি সম্বন্ধে তাঁহার অভিজ্ঞতার বিষয় জ্ঞাত হইয়া গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে বর্দ্ধমান ষ্টেটে সুজামুটার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত

করেন। সেখানে একটী ঘটনা ঘটে যাহাতে বঙ্গের একটা মহদুপকার সাধিত হয়। সেই ঘটনাটির বিবরণ নিম্নে দ্বিজেন্দ্রলালের ভাষাতেই উদ্ধৃত হইল। পাঠক ইহাতে দেখিবেন, দ্বিজেন্দ্রলালের তেজস্বিতা, গরীব প্রজাদের দুঃখে সহানুভূতি এবং নিজের বিপদ ডাকিয়া আনিয়াও তাহাদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা এবং ন্যায়াবলম্বী দ্বিজেন্দ্রলালের বিজয়। দ্বিজেন্দ্র নিজেই লিখিতেছেন— 'আমি বর্দ্ধমান ষ্টেটে সুজামুটা পরগণার সেটেলমেণ্ট অফিসার নিযুক্ত হই। উক্ত কাজ তিন বৎসর কাল করি। উক্ত সেটেলমেণ্টসংক্রান্ত একটী ঘটনা ঘটে, যাহাতে বঙ্গদেশের একটী উপকার সাধিত হয়। আমার পূর্ব্ববর্ত্তী সেটেলমেণ্ট অফিসারেরা জরীপে জমী বেশী পাইলেই খাজানাও বেশী ধার্য্য করিয়া দিতেন। আমি সুজামুটা সেটেলমেণ্টে এই অভিপ্রায় প্রকাশ করি যে, এইরূপ খাজানা বৃদ্ধি করা অন্যায় ও আইন বিরুদ্ধ। প্রজার সহিত যখন পূর্ব্বে জমি বন্দোবস্ত করিয়া দেওয়া হয়, তখন মাপিয়া দেওয়া হয় না, আন্দাজ করিয়া সেই জমির পরিমাণ হস্তবুদে লেখা হয়। এমন কি, এরূপ হওয়া সম্ভব যে, সেই জমিই এখন জরীপে তাহা অপেক্ষা অধিক বলিয়া প্রতীত হইতেছে মাত্র। তাহার জন্য তাহার নিকট অধিক খাজানা চাওয়া অন্যায়। অতএব রাজা বা জমিদার যদি বেশী জমির বেশী খাজানা দাবী করেন, তবে তাহাকে দেখাইতে হইবে যে, প্রজা কোন্ জমিটুকু বেশী অধিকার করিয়াছে। আর ড্রেণেজ খাল বন্ধ হওয়ায় জমির বাৎসরিক ফসল কম হইয়া যাওয়ার জন্য আমি প্রজা-দিগকে খাজানা কমাইয়া দিই।

"এই রায় হইতে জজের নিকট আপীল হয়, এবং তাহাতে জজ

সাহেব উক্ত রায় উল্টাইয়া প্রজাদিগের খাজানা বৃদ্ধি করিয়া দেন। এই সময় স্যার চার্লস্ এলিয়ট্ বঙ্গদেশের লেপ্টেনাণ্ট গবর্ণর ছিলেন। তিনি উক্তরূপ বিভ্রাট দেখিয়া, উক্ত বিষয় তদন্ত করিয়া স্বয়ং মেদিনিপুরে আসেন, ও কাগজপত্র দেখিয়া আমাকে যথোচিত ভৎ'সনা করেন। আমি আমার মত সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশীয় সেটেলমেণ্ট আইন বিষয়ে তাঁহার অনভিজ্ঞতা বুঝাইয়া দিই। ছোটলাট বলেন,—'আমি নিজে সেটেলমেণ্ট অফিসার ছিলাম! আমি সেটেলমেণ্ট কাজ বেশ বুঝি।' তদুত্তরে বলি যে, 'আপনি পাঞ্জাবে সেটেলমেণ্ট কাজ করিয়াছেন। পঞ্জাবের সেটেলমেণ্ট আইন ও বঙ্গদেশের সেটেলমেণ্ট আইন একপ্রকার নহে। উহাদের মধ্যে প্রভেদ আছে।' এই উত্তর শুনিয়া ছোটলাট আমার পূর্ব্ব ইতিহাস জানিতে চাহেন ও তাহা অবগত হইয়া কলিকাতায় গিয়া ভবিষ্যতে সেটেলমেণ্ট অফিসারদিগের কর্ত্তব্য বিষয়ে এক দীর্ঘ মন্তব্য লিখেন এবং তাহাই আইনে ("সেটেল-মেণ্ট ম্যানুয়েলের" নোটের ভিতর) ঢুকাইয়া দেন, এবং কিছুদিন পরে আমার প্রমোশন বন্ধ করেন।

"ইত্যবসরে জজের রায়ের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল হইল। হাইকোর্ট জজের রায় উল্টাইয়া দিয়া আমার মতের সহিত ঐক্য প্রদর্শন করেন; এবং সেই হাইকোর্টের "রুলিং" অনুসারে এখন বঙ্গদেশের সমস্ত সেটেলমেণ্ট কার্য্য চলিতেছে। এখন জরীপে জমি বেশী পাইলেই প্রজার অসম্মতিতে আর খাজানা বৃদ্ধি হয় না। ইত্যবসরে হাইকোর্টে আর একটী আপীলে স্যার্ চার্লসের উক্ত মন্তব্যও নির্দ্দয়ভাবে সমালোচিত হয়। তাহাতে

তিনি সেগুলি 'সেটেলমেণ্ট ম্যানুয়েল' হইতে উঠাইয়া লইতে বাধ্য হন।" *

এইরূপে দ্বিজেন্দ্রলাল সকল বিপদের ঝঞ্ঝা নিজে মস্তক পাতিয়া নিয়াও ন্যায়ের পক্ষে কর-প্রপীড়িত দুর্ব্বল প্রজাদের সাহায্যে দাঁড়াইতে বিন্দুমাত্রও ভীত বা কুণ্ঠিত হন নাই। এইরকম ভাবে স্পষ্টরূপে নিজের 'হর্ত্তাকর্ত্তা বিধাতার' মুখের সাম্‌নে দাঁড়াইয়া তাঁহার অনভিজ্ঞতা প্রমাণ করিতে দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় সৎসাহসী সত্যপর নৈতিক বলে বলীয়ান্ ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব হয় না।

হাসির গানগুলি রচনা করিবার সময় হইতেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার পূর্ব্বতন অভ্যাস 'বিলিতি ধরণে হাসা, ফরাশি ধরণে কাশা' প্রভৃতি ত্যাগ করিতেছিলেন। 'স্ত্রীকে ছুড়ি কাটা ধরান, মেয়েদের জুতো মোজা, দিদিমাকে জ্যাকেট কামিজ পরাইবার' মতগুলিও এখন হইতে তিনি বর্জ্জন করিতে থাকেন। প্রথম প্রথম হয়ত তিনি বিলাতি আদর্শে এ সমাজটাকে গঠিত হইতে দেখিবার বাসনা করিয়াছিলেন; কিন্তু যেই মুহূর্ত্তে তিনি তাঁহার ভ্রম সম্যকরূপে বুঝিতে পারিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতেই তিনি ঐ সব বিলাতি চালচলন একেবারে বর্জ্জন করিয়া ফেলিলেন, এবং নিজের পূর্ব্বতন মতগুলিকে নেহাৎ অসার জ্ঞানে তাহার যথেষ্ট নিন্দা ও শ্লেষ করিতে লাগিলেন। পূর্ব্বে বিলাতফের্ত্তাদের সম্বন্ধে তাঁহার যে অতি উচ্চ ধারণা ছিল, তাহা তাঁহার 'একঘরে' পুস্তিকায় দেখা যায়। তিনি মনে করিতেন বিলাত-

* দ্বিজেন্দ্রলালের বন্ধু শ্রদ্ধেয় দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয় প্রণীত "দ্বিজেন্দ্রলাল" হইতে।

ফের্ত্তারা সাধারণ বাঙ্গালী হইতে অনেক শ্রেষ্ঠ। কিন্তু দেশে যখন তিনি কয়েকজন বিলাতফের্ত্তার অধোগতি দেখিলেন, তখনই তিনি তাহাদের চিত্র উন্মুক্ত করিয়া সকলকে দেখাইতে একটুও দ্বিধা করিলেন না। 'প্রায়শ্চিত্তের' ভূমিকায় লিখিয়াছেন,—"আমি এগ্রন্থে বিলাতফের্ত্তা সম্প্রদায়ের নিকৃষ্ট শ্রেণীর একটী ছবি দিবার চেষ্টা করিয়াছি। তাহা অতিরঞ্জিত নহে।" এই গ্রন্থেই তিনি চম্পটি সাহেবকে পুরাদস্তুর হিন্দু বানাইয়া বিলাতি আচার ব্যবহার সম্বন্ধে তাহাকে দিয়া বলাইতেছেন,—"বেঁচেছি ; বাপ্! বিলিতি চাল কি আমাদের দেশে পোষায় ? বিলিতি লাঙ্গল কি আমাদের দেশের গরুতে টান্‌তে পারে ? না বিলিতি পোষাক বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায় ? না বিলিতি খানা এদেশে সহ্য হয় ? একে তো এদেশের সঙ্গে খাপ খায় না, তার উপর বিপর্য্যয় খরচ।" আবার—"বাপ্! সাহিবী করা কি এ গরিবের দেশে পোষায় ? চেয়ার চাই, টেবিল চাই, ক্যাবিনেট চাই, আরাম চেয়ার চাই। আর্য্য ঋষিগণ কেমন সুবিধে কোরে গিয়েছেন দেখ দেখি ; একখানা তক্তপোষের উপর এক সতরঞ্চ বিছোও—তাতে যত খুসী লোক বোস, শোও, নাচো, গাও, আর গুড়্‌গুড়ি টান,—ব্যস্। এখন বেশ্ বুঝতে পাচ্ছি যে ছেঁড়া পেণ্টেলুনের চেয়ে ছেঁড়া ধুতি চাদরই বাঙ্গালীর অঙ্গে শোভা পায়—দেখ্‌তে পাচ্ছি যে ছেলেমেয়েগুলোকে ফিরিঙ্গির ছেলে করার চেয়ে বাঙ্গালীর ছেলে করাটাই বহুৎ আচ্ছা। দেখ্‌ছি যে বিলিতি চালের চেয়ে বাঙ্গালীর পক্ষে দেশী চালই বহুৎ আচ্ছা। বাঙ্গালীর বাঙ্গালিয়ানাই বহুৎ আচ্ছা।"

এইরূপে তিনি সম্পূর্ণরূপে বিলাতি ভাব ত্যাগ করিয়া খাঁটি হিন্দু—যথার্থ ব্রাহ্মণ হইলেন। সেই হ্যাট কোট বুট কোথায় চলিয়া গেল। এই পরিবর্ত্তনের পরে তিনি উন্মুক্ত হৃদয়ে সরল প্রাণে সকলের সহিত মেলামেশা করিতে লাগিলেন এবং হাস্যপরিহাসে বন্ধুবান্ধব ও সুহৃদ্ সজ্জনকে আনন্দের হিল্লোলে ভাসাইতে লাগিলেন। এই সময়ে (১৮৯৪ খৃষ্টাব্দে) তিনি আবগারী বিভাগের প্রথম ইন্‌স্‌পেক্টারের কার্য্য করিতেন এবং সাত আট বৎসরকাল তিনি ঐ কাজ অতি যোগ্যতার সহিত সম্পন্ন করিয়াছিলেন। এই পদে নিযুক্ত থাকার সময়ে তাঁহাকে অবিরত বঙ্গের বহুস্থানে ভ্রমণ করিতে হইত, এবং তখনই তিনি নানা সমাজের নানা প্রকৃতির লোকের সঙ্গে মিশিয়া লোকচরিত্র অধ্যয়নের সুযোগ পাইয়াছিলেন। এই সুযোগেই বঙ্গের প্রাকৃতিক শোভা দেখিয়া মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার পূর্ব্বতন আকর্ষণ দৃঢ়তর হইতে থাকে। এই সময়ে তিনি দেশে দেশে তাঁহার 'হাসির গানের' অমৃত ছড়াইতেন।

বিবাহিত জীবনের প্রথম কয়েকটা বছরেই তাঁহার অপূর্ব্ব হাস্যরসের আধার ব্যঙ্গাত্মক প্রহসন "কল্কী অবতার", "ত্র্যহস্পর্শ", "প্রায়শ্চিত্ত," "বিরহ" প্রকাশিত হয় এবং রঙ্গব্যাঙ্গের প্রস্রবণ "আষাঢ়ে" ও "হাসির গানও" এই সময়ে মুদ্রিত হইয়া বাহির হয়। এতদ্ভিন্ন নাট্যকাব্য "পাষাণী" ও "সীতা" এবং "মন্দ্র" কাব্যও এই সময় প্রচারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রলালের ভাবী নাট্যপ্রতিভা এই সময় সর্ব্বপ্রথমে তাঁহার "তারাবাই" নাটকে স্পষ্টরূপে ব্যক্ত হয়। এই নাটকখানি রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইলে, সকলেই ইহার ভূয়সী প্রশংসা

করিয়াছিল ; এবং দ্বিজেন্দ্রলাল একজন নিপুণ নাট্যকাররূপে জনসমাজে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন ।

এই সময়ে তিনি সদানন্দ পুরুষ। মুখে সদাই হাসি লাগিয়া থাকিত ; জীবনটা বেশ্ মোলায়েম ভাবে হাসি ও গানে অতিবাহিত হইতেছিল। এই সদানন্দ প্রকৃতি, এই হাস্যমুখর জীবন তাঁহার লিখিত এই সময়কার প্রত্যেক পুস্তকে—প্রত্যেক গানে অভিব্যক্ত।

তিনি যখন কার্য্য-নিবন্ধন প্রবাসে নিশ্চিন্তমনে অতি আনন্দে জীবন যাপন করিতেছিলেন, তখন হঠাৎ সংবাদ আসিল, তদীয় পত্নী দেবী সুরবালা কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত। সংবাদ পাওয়া মাত্র দ্বিজেন্দ্র-লাল উদ্ভ্রান্ত ভাবে কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইলেন। কিন্তু হায়! ইতিমধ্যে সকলই ফুরাইয়াছে!

---

(৬)

স্বামিভক্তিতে, রূপে, গুণে, গৃহকর্ম্মদক্ষতায় সুরবালার নাম সম্পূর্ণ সার্থক হইয়াছিল। বিবাহের পর যে কয়বৎসর তিনি জীবিতা ছিলেন, দ্বিজেন্দ্রলালের জীবনকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছিলেন। পূর্ণ দাম্পত্যপ্রেমের অধিকারী হইয়া তাঁহাদের বিবাহিত জীবন অতি স্বচ্ছন্দে, অতীব সুখে অতিবাহিত হইতেছিল। উপর্য্যুপরি একটী পুত্র ও একটী কন্যা জন্মিয়া তাঁহাদের এই মধুময় দাম্পত্য জীবনকে আরও মধুময় করিয়াছিল। ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে একটী মৃতা কন্যা প্রসব

করিয়া ২৯শে নভেম্বর তারিখে হঠাৎ হৃদ্‌পিণ্ডের ক্রিয়া বন্ধ হইয়া দেবী সুরবালা সুরলোকে প্রস্থান করিলেন।

বাড়ী আসিয়া যখন দ্বিজেন্দ্রলাল দেখিলেন, তাঁহার গৃহ শূন্য, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, সহচরী, সখী—একাধারে তাঁহার সকলই—চিরতরে তাঁহার জীবনকে মরুভূমি করিয়া, সেই শিশুছুইটীর সমস্ত ভার তাঁহারই হস্তে ন্যস্ত করিয়া চলিয়া গিয়াছেন, তখন দ্বিজেন্দ্রলাল একেবারে ভাঙ্গিয়া পড়িলেন। মাতৃহারা অবোধ পুত্রকন্যা ছুইটী যখন অসীম নির্ভরতার সহিত তাঁহাদের পিতাকে জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে লাগিল, তখন তিনি অন্তরের নিরুদ্ধ বেগ কতক সাম্‌লাইয়া তাহাদিগকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। তাহাদিগকে শান্ত করিবার সময় তিনি নিজে সান্ত্বনা পাইলেন কৈ? তাঁহার জীবনের অতীত স্বপ্নময় দিনগুলি একে একে তাঁহার স্মরণ পথে আসিতে লাগিল। স্নেহময় পিতামাতা তাঁহার অবর্ত্তমানে স্বর্গে চলিয়া গেলেন;—সমাজ তাঁহাকে ত্যাগ করিল;—এই সময়ে যিনি তাঁহার গৃহলক্ষ্মী ছিলেন—তিনিও ফাঁকি দিয়া চলিয়া গেলেন—দ্বিজেন্দ্রলাল সব হারাইলেন। এখন এই মাতৃহারা শিশুছ'টীই তাহার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য, একমাত্র সান্ত্বনা, একমাত্র ভরসা হইল।

এই দুর্ঘটনা দ্বিজেন্দ্রলালের স্বভাবকে একেবারে বদ্‌লাইয়া দিয়া গেল। এর পর অনেক দিন তিনি আর লোকের সঙ্গে খুব বেশী মেশামেশি করিতে পারিতেন না। তাঁহার সেই হাস্যমুখর জীবন যেন পত্নীর জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই অন্তর্হিত হইয়া গেল। বিবাহিত জীবনে তাঁহার প্রতি গানে, প্রতি কথায়, প্রতি

পদ্যে হাসি যেন উছলিয়া পড়িত। কিন্তু এই দুর্ঘটনার ফলে তাঁহার জীবন এবং রচনা সমভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। এ ঘটনার পর হাসিতে চেষ্টা করিয়াও তিনি যেন হাসিতে পারেন নাই ; হাসিটা যেন করুণায়—ক্রন্দনে পরিবর্ত্তিত হইয়া উঠিয়াছে। পরবর্ত্তী জীবনের লেখায় এই ভাবটা স্পষ্টই ফুটিয়া বাহির হইয়াছে।

সময়ের স্রোতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিপর্য্যস্ত মনটাকে কথঞ্চিৎ গুছাইয়া লইলেন। তিনি স্পষ্টই বুঝিলেন এবং বুঝিয়াই গাহিলেন—

"দুঃখ মিছে, কান্না মিছে ; দু'দিন আগে, দু'দিন পিছে।
একই পাথারে গিয়ে মিলেছে সব নদী।"

এমনই ভাবে অতি ধীরে তাঁহার অন্তরে সান্ত্বনা আসিল বটে, কিন্তু সেই বিমল হাস্যধারা আর ফুটিয়া উঠিল না। তিনি নিজেই বলিতেছেন—

"নাহি শোভে হাসি আর আজি দিন কাঁদিবার
হেসেছি হৃদয় ভরি সুখের হাসির দিনে।"

বঙ্গনারীতে সদানন্দরূপী দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন,—"প্রেমের গান আর গাই না, হাসির গান আর গাই না। সে দিন গিয়েছে। হাসি তামাসার দিন গিয়েছে, আমারও গিয়েছে, সমাজেরও গিয়েছে।"

এই সময়ে তিনি আবগারী বিভাগের ভবঘুরে বৃত্তি ত্যাগ করিয়া আবার ডেপুটিগিরি আরম্ভ করিলেন।

পত্নী-বিয়োগের পর কয়েক মাস অতীত হইতে না হইতেই, তিনি অবসাদ-নির্জ্জীব প্রাণটাকে একটু সজীব করিবার উদ্দেশ্যে শুভক্ষণে আবার কলম ধরিলেন। ইহার ফল তাঁহার অমর লেখনী-

প্রসূত "প্রতাপসিংহ"। দেবী সুরবালার মৃত্যুর প্রায় এক বৎসর পরে এই নাটকখানি প্রকাশিত হয়। সেই স্বদেশীর দিনে এই নাটকখানি অভিনীত হইয়া দর্শকগণের হৃদয় এক অপূর্ব্ব স্বদেশ-ভক্তিতে সঞ্জীবিত করিয়াছিল।

এই রকম ভাবে যখন তিনি নিজের শোকক্লিষ্ট মনটাকে কতকটা স্বাভাবিক অবস্থায় আনিলেন, তখন তাঁহার আর এক নূতন বিপদ উপস্থিত হইল। তিনি এই নূতন বিপদে বড়ই বিভ্রাটে পড়িয়া গেলেন। দ্বিজেন্দ্রের আত্মীয় স্বজন বন্ধুবর্গ তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিবাহ করিতে পুনঃ পুনঃ অনুরোধ করিতে লাগিলেন। এই সময়ে দ্বিজেন্দ্র-লালের বয়স সবেমাত্র ৩৮ বৎসর। সকলেই যুক্তি দিতে লাগিলেন যে, এই বয়সে বিবাহ করাই সঙ্গত, এবং স্ত্রীবিয়োগ হইলে সকলেই এই বয়সে বিবাহ করিয়া থাকে। বিবাহ করিলে তাঁহার শূন্য সংসার আবার পূর্ণ হইবে ; ছেলেমেয়ে দু'টীরও বেশ্ যত্ন চলিতে পারিবে। বিপত্নীক দ্বিজেন্দ্রলালের ত আর সাধ্য নাই যে, মায়ের মত ছেলেমেয়ের যত্ন করিতে পারে। এইরূপ বহু যুক্তি দেখাইয়া সকলেই তাঁহাকে পুনর্ব্বিবাহে সম্মত করাইতে যথাসম্ভব চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু দ্বিজেন্দ্রলালের সেই এক কথা—"আর বিবাহ করিব না।" তিনি সাহিত্য সেবাদ্বারা তাঁহার বাকী জীবন কাটাইতে মনস্থ করিয়াছিলেন। সকলেই কিন্তু তাঁহার এই মনের ভাব—অপর-সাধারণের পত্নী বিয়োগের পর যেরূপ কয়েক দিন একটা উদাস ভাব হয়—সেইরূপ বলিয়াই ধরিয়া লইলেন এবং নানাস্থানে সম্বন্ধ দেখিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি নির্ব্বন্ধসহকারে তাঁহাদিগকে

সেই চেষ্টা হইতে বিরত হইতে বলিলে, তাঁহারা অগত্যা বাধ্য হইয়া নিরস্ত হইলেন।

এই দ্বিতীয়বার বিবাহ সম্বন্ধে তাঁহার একেবারেই মত ছিল না। তিনি বলিতেন—বিধবাই হউক বা বিপত্নীকই হউক, সকলের পক্ষেই ব্রহ্মচর্য্য-পালন করাই সম্পূর্ণ সঙ্গত। তবে যদি তাহাদের কারও পক্ষে ব্রহ্মচর্য্য-ব্রত পালন করা সম্ভবপর না হয়, তবে সমাজে যাহাতে ব্যভিচার প্রবেশ করিয়া সমাজ কলঙ্কিত না হয়, সেইজন্য কেহ কেহ—সে বিধবাই হউক, বা বিপত্নীকই হউক—পুনর্ব্বিবাহ করিতে পারে বটে, তবে জোর জবরদস্তি করিয়া বিধবা বা বিপত্নীক কাহাকেও বিবাহ দেওয়া নিতান্ত অসঙ্গত। আর, এক স্ত্রী বর্ত্তমানে অন্য বিবাহ, এরূপ কুপ্রথা সমাজ হইতে একেবারে লোপ পাওয়া সর্ব্ব-প্রকারে বাঞ্ছনীয়। যাহারা বিপত্নীক পুরুষের পক্ষে পুনর্ব্বিবাহ সঙ্গত এবং বিধবা স্ত্রীলোকের পক্ষে তাহা সম্পূর্ণ অবৈধ বলিয়া মনে করেন, দ্বিজেন্দ্রলাল তাহাদিগকে একচোখা বলিতেন। তিনি এবিষয়ে স্ত্রী পুরুষের কোন প্রভেদ থাকা আদৌ যুক্তিসহ বিবেচনা করিতেন না।

দ্বিজেন্দ্রলাল কিন্তু স্ত্রীবিয়োগের পর বাকী জীবন ব্রহ্মচর্য্যই পালন করিলেন। লোকে তাহাকে নিন্দা করিলে, তিনি গ্রাহ্যও করিতেন না। লোকমত তিনি বরাবরই অগ্রাহ্য করিয়া চলিতেন। তাঁহার বিশ্বাস ছিল অধিকাংশ লোকই কোনরূপ যুক্তি তর্ক বা মীমাংসা না করিয়া অন্ধভাবে কোনএকটা বিশেষ রীতির অনুসরণ করে। 'আগে লোক ভাব্‌তে শিখুক, পরে তাদের কথা শুনা যাইবে', ইহা তিনি আগাগোড়াই বলিতেন। তাই থিয়েটারের মহল্লায় যোগ দেওয়া,

বা থিয়েটারে অবাধে যাওয়া লইয়া অনেকে দ্বিজেন্দ্রের নিন্দা করিলে তিনি হাসিয়াই উড়াইয়া দিতেন—বলিতেন, "লোকের কথায় কারো না প্রত্যয়, লোকে কি না বলে !"

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, স্ত্রীবিয়োগের পর হইতে দ্বিজেন্দ্রলালের এক নূতন জীবন আরম্ভ হয়। জীবনের প্রথমভাগে যাঁহাকে বিষাদভাবাপন্ন, চিন্তাশীল, সর্ব্বদা একক থাকিতে ইচ্ছুক দেখিয়াছি,—জীবনের মধ্যভাগে বিবাহের পর যাঁহার জীবন হাস্যমুখর চিন্তালেশ-মাত্রহীন বালকের ন্যায় সরল মধুররূপে প্রতীমান হইয়াছে,—পত্নীবিয়োগের পর সেই দ্বিজেন্দ্রলালের জীবন দুঃখশোকময় একটা গভীর বিষাদ ভাবে পূর্ণ হইয়াছে; সেই হাস্যমধুর জীবন কোথায় যেন চলিয়া গিয়াছে; যদি বা কখন হাসিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই হাসি যেন কান্নার সুরে মিশাইয়া গিয়াছে,—সেই সরল বিমল প্রাণ-খোলা হাসি আর নাই।

তিনি তাঁহার শেষ জীবন অসীম সংযতভাবে যাপন করিতে লাগিলেন। লোকদৃষ্টিতে তাঁহার কোন কোন আচরণ দূষ্য বলিয়া বিবেচিত হইলেও—তিনি যে সম্পূর্ণ নিষ্কলঙ্ক চরিত্র ছিলেন, ইহা বলিলে অত্যুক্তি ত হইবেই না, বরঞ্চ খাঁটি সত্য কথা বলা হইবে। তাঁহার আত্মসংযম ছিল তুলনাহীন। বাস্তবিক, দ্বিজেন্দ্রলালের ন্যায় নির্ভীক, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয় পুরুষ খুব কমই দেখা যায়।

দ্বিজেন্দ্র যখন কলিকাতায় বাস করিতেছিলেন, তখন তাঁহার গৃহে প্রত্যহ বহু সাহিত্যিক, বন্ধুবান্ধব বৈকালে একত্রিত হইয়া সাহিত্যিক তর্ক, হাস্যকৌতুক, গান বাজনাদি করিত। এই ব্যাপারে

তাঁহার গৃহে প্রত্যহই হইত। দ্বিজেন্দ্রলাল এই সাহিত্যিক মিলনটাকে আরও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিবার জন্য প্রতি পূর্ণিমায় সাহিত্যিকদের একটা বৈঠক করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহাই বিখ্যাত "পূর্ণিমা-মিলন"—যে মিলনে কবিবর রবীন্দ্রনাথ হইতে ছোট বড় সকল কবি এবং সাহিত্যিকই একত্রিত হইতেন। এই "পূর্ণিমা-মিলন" উপলক্ষ করিয়াই দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের গৃহে পূর্ণিমা মিলনের বৈঠকে গাহিয়াছেন—

"সাহিত্যিক সব ছোট বড়, এইখানেতে হ'য়ে জড়,
সবাই, আনন্দে ও ভ্রাতৃভাবে কর্ত্তে হবে কালহরণ।
... ...
যাদের, আছে কিছু ভায়ের প্রতি মাতৃভাষায় প্রতি টান;
তাদের কর্ত্তে হবে পরস্পরের প্রীতিদান ও প্রতিদান
হেথায়, অনত্যুচ্চ কলরবে মেলামেশা কর্ত্তে হবে,
—শুনুন এটা হচ্ছে সাহিত্যিকী পৌর্ণমাসী সম্মিলন,
—দোহাই, ধর্ব্বেন না কেউ হ'ল একটু অশুদ্ধ যা ব্যাকরণ।"

কতকগুলি অধিবেশনের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল যখন কর্ম্মোপলক্ষে বিদেশে, তখন ভাষার অসীম স্বাস্থ্যপ্রদ এই সম্মিলন ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া যায়।

এই পূর্ণিমা-মিলনের কয়েকটী মাত্র অধিবেশনের পরেই দ্বিজেন্দ্রলালকে কার্য্যোপলক্ষে কলিকাতা ত্যাগ করিতে হয়।

---

[৭]

দ্বিজেন্দ্রলাল দীর্ঘ একবৎসর কাল ছুটী নিয়া পুত্রকন্যাসহ কলিকাতায় বাস করিলেন। সেই সময় বঙ্গদেশ প্রবল স্বদেশী আন্দোলনে ভরপুর। স্বদেশপ্রাণ দ্বিজেন্দ্রলাল আন্তরিকতার সহিত সেই স্বদেশী আন্দোলনে যোগদান করিয়াছিলেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এই দেশব্যাপী আন্দোলনের সময়ই তাঁহার সুপ্রসিদ্ধ "প্রতাপসিংহ" অভিনীত হইতে থাকে। প্রথম হইতেই দ্বিজেন্দ্র-লালের স্বাধীনচিত্ততা, স্পষ্টবাদিতা প্রভৃতির জন্যই বোধ হয় তিনি তৎকালের উপরিস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের তত প্রিয় ছিলেন না, এবং তজ্জন্য তাঁহার প্রমোশনও বন্ধ হইয়াছিল। তদুপরি প্রকাশ্যভাবে এখন এই স্বদেশী-আন্দোলনে যোগ দেওয়ার জন্য এবং বোধ হয় প্রতাপসিংহ প্রণয়ন করার জন্য তাঁহাকে আরও লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হয়, এবং ইহার ফলে দ্বিজেন্দ্রলাল চাকুরীর উপর একেবারে হাড়েচটা হইয়া যান। অবশ্যই তিনি কোনও দিনই দাসত্ব করিবার পক্ষপাতী ছিলেন না; দাসত্বকে তিনি বরাবরই ঘৃণা করিতেন; চাকর হিসাবে তাঁহার আরদালী ও তাঁহার নিজের মধ্যে কোন তফাৎ আছে, ইহা তিনি ধারণাই করিতেন না। কাজেই তিনি সকল সময়ই তাঁহার নীচস্থ কর্ম্মচারিগণের সঙ্গেও সমভাবেই মিশিতেন। তবে, তাঁহাকে নেহাৎ দায়ে পড়িয়াই চাকুরী করিতে হইয়াছিল। "চাকুরী না করিলে খাইব কি," এই ভাবনা সকল বাঙ্গালীর ন্যায় তাঁহারও ছিল, এবং চাকুরীই ছিল তাঁহার জীবনে

একটা অভিশাপস্বরূপ; এই চাকুরীর জন্যই অনেক সময় তিনি উপযুক্তভাবে সাহিত্য চর্চা করিতে পারিতেন না এবং খুব সম্ভব এই দাসত্ব-বন্ধন না থাকিলে বঙ্গভাষা তাঁহার নিকট হইতে আরও অনেক রত্ন পাইত। কি রকম ভাবে চাকুরীটা দ্বিজেন্দ্রলালের পক্ষেও অভিশাপ হইয়া উঠে, তাহা তাঁহার পরবর্ত্তী চাকুরীজীবন দেখিলেই স্পষ্টতঃ বুঝা যায়।

ছুটী ফুরাইয়া গেলে, দ্বিজেন্দ্রলালকে খুলনায় বদলি করা হইল। এইখানে তিনি নূতন ধরণে, নূতন ছাঁচে বিখ্যাত রাঠোর বীর দুর্গাদাসের চরিত্রাবলম্বনে তাঁহার বিখ্যাত "দুর্গাদাস" নাটক লিখিতে আরম্ভ করেন। কয়েকদিন খুলনা থাকিবার পরেই তাঁহাকে বহরমপুর বদলি করা হয়। বহরমপুরে কয়েকদিন থাকিতে না থাকিতেই সেখান হইতে তাঁহাকে কাদীতে বদলি করা হয়। পুনঃ পুনঃ এইরূপ নানা যায়গায় বদলি করাতে দ্বিজেন্দ্রলাল বিষম রকম উত্যক্ত হইয়া পড়েন, এবং বাধ্য হইয়া ছুটীর আবেদন করেন। কিন্তু গবর্ণমেণ্ট তাঁহার ছুটীর আবেদন মঞ্জুর না করিয়া, তাঁহাকে কাদী হইতে একেবারে গয়ায় বদলি করেন। সেখানে বছর যাইতে না যাইতে তাঁহাকে কয়েকদিনের জন্য জাহানা-বাদ পাঠান হয়। এবার দ্বিজেন্দ্রলাল ভয়ঙ্করভাবে বিরক্ত হইয়া এরকম যাচ্ছে তাই বদলির বিরুদ্ধে আন্দোলন করিয়াও কোন ফলই পাইলেন না। কি করিবেন, বাঙ্গালী জাত; চাকুরী ছাড়া ত গতি নাই! কাজেই তাঁহাকে কর্ত্তৃপক্ষের ব্যবস্থা মতই চলিতে হইল। যাহা হৌক, গয়াতে গিয়া তিনি "দুর্গাদাস" নাটক শেষ করেন এবং গয়াতে থাকিতে থাকিতেই তাঁহার "দুর্গাদাস" প্রচারিত হয়।

দ্বিজেন্দ্রলাল বুঝিয়াছিলেন, কেবল অন্ধ দেশভক্তি বা স্বজাতির প্রতি অনুরাগ জাতীয় জীবন গঠন করে না ; ইহার সহিত সত্যনিষ্ঠা, ন্যায় ও বিবেক বুদ্ধি ও নৈতিকবল প্রত্যেক দেশবাসীর প্রধানতম উদ্দেশ্য হইলে এবং ঐ সকল গুণ জাতির প্রত্যেকের হৃদয়ে বদ্ধমূল হইলে, তবে জাতীয় জীবন গঠিত হইবে,—তবে জাতি উঠিবে ; নচেৎ কোন আশা নাই। তিনি বুঝিয়াছিলেন, প্রতারণা, তোষা-মোদের জন্য সত্যের অপলাপ, অনর্থক স্বজাতি বা বিজাতি যাহাকেই হউক পীড়ন—এইগুলি জাতীয় জীবন গঠনের ভয়ানক অন্তরায় ; কাজেই তিনি দিলীর খাঁকে দিয়া বলাইয়াছেন,—"যে যুগে ভ্রাতাকে তার অংশ হ'তে বঞ্চিত করে আনন্দ ; ক্ষুদ্র স্বার্থের জন্য স্বজাতিদ্রোহ করে পরিতৃপ্তি ; যে যুগে তোষামোদ, পীড়ন, মিথ্যাবাদ, প্রতারণা চারিদিকে ছেয়ে পড়েছে ; সে যুগে তোমার (দুর্গাদাসের) মত ত্যাগী দেখে আত্মা শুদ্ধ হয়।" তারপর এক সম্প্রদায়ের প্রতি অন্য সম্প্রদায়ের বিদ্বেষ ভাব যে ভারতের জাতীয় জীবনকে কত শক্তিহীন করিয়াছে, সেই বিদ্বেষ ভাব দূর করিয়া যদি এক সম্প্রদায় অন্য সম্প্রদায়কে সাহায্য করিত, তবে যে জাতি কত বলিষ্ঠ, কত দৃঢ় ও উন্নত হইত, তাহা বুঝাইবার জন্য দুর্গাদাস বলিতেছেন,—"যোদ্ধা বটে মারাঠা জাতি !—অদ্ভুত অশ্বচালনা, অদ্ভুত সমর-কৌশল, অদ্ভুত সহিষ্ণুতা ; এর সঙ্গে যদি রাজপুত জাতির একাগ্রতা, ত্যাগ আর দৃঢ়তা পেতাম, কি না হতে পার্ত্তো ! না, তা' হবার নয়। ভারতের ভাগ্য সুপ্রসন্ন নয়। হিন্দুজাতি যে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে গিয়েছে, আর এক হবার নয়।"

আর একটী কথা, সেই স্বদেশীর সময় দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার সুনিপুণ লেখনী চিত্রিত দিলীরখাঁর মতনই, হিন্দু আর মুসলমান—ভারতের এই দুই প্রধান জাতির মিলনের অলীক স্বপ্ন দেখিতেছিলেন। কিন্তু তাহারা কেন যে মিলিত হইবে না, তাহা বুঝিতেছিলেন না—"তা'রা এতদিন একই আকাশের নীচে, একই বাতাস সেবন করে', একই জল পান করে', একই ভূমিজাত শস্য খেয়ে আসছে। এখনও কি তাদের প্রাণ এক হয় নি?" বাস্তবিক এতদিন পরে তাঁহার সে 'বড় সুখের স্বপ্ন' সফল হইয়াছে। এতদিনে বোধ হয় তাহারা "ধর্ম্মভেদ, জাতিভেদ, আচারভেদ ভুলে, নতজানু হয়ে, করযোড়ে ভক্তি-বাষ্প গদগদস্বরে এই শ্যামলা সুজলা ভারতভূমিকে প্রাণভরে' মা বলে," ডাকিতে শিখিয়াছে।

দ্বিজেন্দ্রলাল প্রথমতঃ এবং প্রধানতঃ চরিত্রবল, দৃঢ়তা, তেজস্বিতা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং তৎসঙ্গে স্বদেশের ও স্বজাতির প্রতি গভীর ভক্তির আদর্শ দেখাইবার জন্য দুর্গাদাস চিত্র এবং হিন্দু-মুসলমানের সাম্য সংস্থাপনের জন্য মুর্ত্তিমান চেষ্টা চিত্রিত করিবার জন্য দিলীর চরিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। সেই আদর্শ চিত্রগুলি ও অন্যান্য ছবিগুলি তাঁহার সুনিপুণ হস্তে পড়িয়া যেন প্রাণস্পর্শী সজীব হইয়া ফুটিয়াছে। তাঁহার সেই অমৃতবর্ষী প্রাণস্পর্শী ভাষায় লিখিত এই দুর্গাদাস নাটক যে বঙ্গে বহুল ভাবে আদৃত হইবে, ইহা বলাই বাহুল্য।

দ্বিজেন্দ্রলাল এই সময়ে তাঁহার সেই চিরবিখ্যাত গান "বঙ্গ আমার জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ" এই সঙ্গীতটী রচনা করেন। এই সঙ্গীতটী বঙ্গে এতই পরিচিত এবং ইহার ভাব, ইহার

ভাষা, ইহার সুর এতই হৃদয়স্পর্শী যে, ইহার সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া এই গানের এবং তৎসঙ্গে কবি-হৃদয়ের সেই মহৎ ভাবের ব্যাখ্যা করিতে গেলে, গানটীর মর্য্যাদা কমিবে বই বাড়িবে না।

গয়া প্রবাস কালেই দ্বিজেন্দ্রলাল তাঁহার "নূরজাহান" শেষ করেন এবং "প্রতাপসিংহে" প্রতাপসিংহ গোবিন্দসিংহের নিকট অমরসিংহ সম্বন্ধে যে ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন, সেই ভবিষ্যদ্বাণীর ফল দেখাইবার জন্য "মেবার পতন" রচনা আরম্ভ করেন। গয়াতে থাকার সময় 'দুর্গাদাস' এবং 'নূরজাহান' ছাড়া তাঁহার "আলেখ্য" নামক কাব্য গ্রন্থখানিও সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছিল।

তিন বৎসর গয়া থাকিবার পর দ্বিজেন্দ্রলাল সুদীর্ঘ পনর মাসের বিদায় লইয়া কলিকাতায় চলিয়া আসেন। তিনি গয়াবাসীকে নিজ উদার চরিত্রগুণে এতই মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, গয়াবাসী বহু গণ্যমান্য লোক একত্রিত হইয়া তাঁহাকে এক বিদায় অভিনন্দন প্রদান করেন, এবং তদীয় স্মৃতি রক্ষার্থে "দ্বিজেন্দ্রলাল লাইব্রেরী" নামে এক সাধারণ পাঠাগার স্থাপন করেন।

---

[৮]

গয়া ত্যাগ করিয়া দ্বিজেন্দ্রলাল কলিকাতায় আসিলেন। ছুটী ফুরাইয়া গেলেও, তিনি কলিকাতাতেই থাকিবার সুযোগ পাইলেন। গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে আলিপুরে ট্রেজারি অফিসার, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি নানা কার্য্যের ভার দিয়া কলিকাতায়ই রাখিয়া দিলেন। তিনিও

বন্ধু বান্ধবদের সহিত মনের সুখে তাঁহার নব-নির্ম্মিত "সুরধাম" নামক বাটীতে থাকিয়াই তাঁহার কার্য্যাদি পরিচালন করিতে লাগিলেন। তিনি কলিকাতায় আসার কিছুদিন পরেই "মেবার পতন" শেষ করিয়া তদীয় নাট্য-প্রতিভার চরম উৎকর্ষ "সাজাহান" লিখিতে প্রবৃত্ত হন। এবং কলিকাতায় যে চারি বৎসর থাকিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন, তন্মধ্যেই "সীতা" নামক নাট্যকাব্য, "সোরাব রুস্তম", "পুনর্জ্জন্ম", "চন্দ্রগুপ্ত", "ত্রিবেণী" নামক কাব্য, "পরপারে", "আনন্দবিদায়", "বঙ্গনারী", "সিংহল-বিজয়" প্রভৃতি কাব্য, দৃশ্যকাব্য, নাটক এবং প্রহসনাদি প্রণয়ন করেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল নিজের সরল স্বভাবের গুণে নিতান্ত বালক হইতে অশীতিপর বৃদ্ধ পর্য্যন্ত সকলের সঙ্গেই সমভাবে সমপ্রাণে মিশিতে পারিতেন; অনেক সময় তিনি অপোগণ্ড শিশুদের লইয়া অবিরত ক্রীড়া কৌতুক করিতে থাকিতেন। তাঁহার এই শিশু স্বভাবের গুণে আকৃষ্ট হইয়া শিশুরা পর্য্যন্ত তাঁহাকে দেখিলে আনন্দ পাইত; এবং তাঁহাকে আপনাদেরই একজন বলিয়া বিবেচনা করিত। এই শিশু-স্বভাবের দরুণই যখন কলিকাতার কয়েকটী যুবক তাঁহাকে তাঁহাদের স্থাপিত "ইভিনিং ক্লাব" নামক সম্মিলনীর সভাপতি হইতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি অতীব আনন্দ সহকারে তাঁহাদের প্রস্তাবে সম্মত হইলেন। "ইভিনিং ক্লাবের" সভাপতি হইয়া তিনি উত্তরোত্তর ইহার শ্রীবৃদ্ধি সাধন করিতে লাগিলেন, এবং যাহাতে এখানে সকল সভ্যেরই শারীরিক ও মানসিক উন্নতি সাধিত হইতে পারে, তাহার নানা প্রকার ব্যবস্থা করিলেন। এই ক্লাব বহুদিন তাঁহার বাটীর

নিম্নতলেই অবস্থিত ছিল এবং এই ক্লাবে বসিয়াই নাকি তিনি তাঁহার শেষ নাটকগুলি রচনা করেন।

নব-নির্ম্মিত "সুরধামে" আসার কিছুকাল পরেই তিনি তাঁহার পুত্র দিলীপকুমারের উপনয়ন সম্পন্ন করেন। এই সময়ে নিমন্ত্রিত যাবতীয় আত্মীয় স্বজন অকুণ্ঠিতচিত্তে তাঁহার বাটিতে আসিয়া এই উৎসবে যোগ দিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে যাঁহারা তাঁহাকে একঘরে করিয়াছিলেন, তাঁহারাও এ সময়ে তদীয় তনয়ের উপনয়নে যোগ দিয়াছিলেন। সকল আত্মীয় স্বজনকে এই উপলক্ষে সমাগত দেখিয়া তিনি তদীয় অন্তরঙ্গ বন্ধু দেবকুমার বাবুকে বলিয়াছিলেন—"ভেবেছিলাম এ জীবনে বুঝি কেবল ঐ 'একঘরেই' হ'য়ে কাটাতে হ'বে। কিন্তু আজ ভাই, আমি যেন একটা মুক্তির আনন্দ অনুভব কর্চ্ছি।" *

তারপর বৈদিক ক্রিয়া কলাপাদির বিষয়ে তিনি তদীয় চরিতকার বন্ধুবরকে বলিয়াছিলেন,—"যখন বৈদিক ক্রিয়া ও অনুষ্ঠানগুলি হচ্ছিল, আমার মনে এমন একটা কেমন অস্থিরতা ও অনুতাপ এল যে, তা' আর কি বল্‌ব। এসব অনুষ্ঠানের আচার ও মন্ত্রাদিতে এমন যে একটা বৈদ্যুতিক পবিত্র প্রভাব আছে, তা' এর আগে আমি কখনও কল্পনাও কর্ত্তে পারিনি। কি চমৎকার উপদেশ! কি অপূর্ব্ব সব সুন্দর ব্যবস্থা! আমরা কি ছিলাম, আর আজ একি হ'য়ে গিছি,—কেবলই যেন এ চিন্তাটা আজ আমাকে কশাঘাত করে' ভিতরে ভিতরে কাঁদিয়ে তুল্‌ছে। আচ্ছা, আবার কি আমরা

---

* দ্বিজেন্দ্রলালের অকৃত্রিম বন্ধু ও চরিতকার শ্রদ্ধেয় দেবকুমার রায় চৌধুরী মহাশয়ের "দ্বিজেন্দ্রলাল" হইতে।

তেমনটি হ'ব না ?" ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম্ম সম্বন্ধে এমন যাঁহার উচ্চ ভাব, সমাজের উন্নতির জন্য যাঁর এত প্রবল আকাঙ্ক্ষা, তাঁহাকেই কি না "একঘরে" হইতে হইয়াছিল। দুর্দ্দৈব আর কি !

উপর্য্যুপরি চারি বৎসর কলিকাতায় থাকার পরে, যখন আমাদের প্রজারঞ্জক সম্রাট আসিয়া বঙ্গভঙ্গ রহিত করিয়া যান, তখন দ্বিজেন্দ্রলালকে বাঁকুড়ায় বদলি করা হয়। তদনুসারে যখন তিনি বাঁকুড়ায় যাইতে প্রস্তুত হন, তখন কলিকাতার ও অন্যান্য স্থানের বহু গণ্যমান্য লোক ও সভাসমিতি হইতে তাঁহাকে অভ্যর্থিত করা হয়। তিন চারি মাস পরেই আবার তাঁহাকে মুঙ্গেরে বদ্‌লী করা হইলে, তিনি কয়েকদিনের জন্য কলিকাতায় আসেন। কিন্তু এবার আর তাঁহাকে ফিরিয়া যাইতে হইল না। সন্ন্যাস রোগে আক্রান্ত হওয়ায়, তাঁহার শরীর এসময়ে বিশেষ রকমে ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। তিনি ডাক্তারের পরামর্শ মত কার্য্যে আর যোগ দিলেন না এবং বিদায়ের প্রার্থনা করিলেন। এই বিদায়ই তাঁহার কর্ম্মজীবনের শেষ বিদায় !

এই সময়ে ডাক্তার তাঁহাকে সাত্ত্বিক নিরামিষ আহার করিতে এবং সর্ব্বপ্রকার মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে উপদেশ দেন। তিনি খাদ্যাদি সম্বন্ধে অতঃপর ডাক্তারের উপদেশ মতই চলিতে লাগিলেন, কিন্তু মানসিক পরিশ্রম হইতে বিরত থাকিতে পারিলেন না ; এই দুর্ব্বল রোগজীর্ণ শরীর নিয়াও তিনি সাহিত্য-সেবা ছাড়িলেন না। মানা থাকিলেও বন্ধুদের সঙ্গে দুরূহ বিষয় নিয়া পূর্ব্বের মতই তর্ক আরম্ভ করিয়া দিতেন এবং পূর্ব্বের মতই সুস্বরে গান গাহিয়া শ্রোতাদিগের কর্ণ পরিতৃপ্ত করিতেন। এই

সময়ে তিনি আবার সাহিত্য-সেবার এক নূতন ধারা অবলম্বন করিলেন।

সুবিখ্যাত পুস্তক বিক্রেতা ৺গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সুযোগ্য পুত্র "ইভিনিং ক্লাবের" উদ্‌যোক্তা শ্রীযুক্ত হরিদাস চট্টোপাধ্যায় মহাশয় দ্বিজেন্দ্রলালের সম্পাদকতায় নিজ ব্যয়ে একখানি শ্রেষ্ঠ শ্রেণীর মাসিক পত্রের প্রচার করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে, দ্বিজেন্দ্রলাল অতীব আনন্দের সহিত তাহার সম্পাদক হইতে রাজী হইলেন। এই নূতন পত্রিকার নামকরণ করা হইল "ভারতবর্ষ"। এইবার দ্বিজেন্দ্রলাল পূর্ণ উদ্যমে এই "ভারতবর্ষ" নিয়া পরিলেন, এবং যাহাতে ইহা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর শ্রেষ্ঠ পত্রিকারূপে পরিগণিত হইতে পারে, তজ্জন্য অক্লান্ত চেষ্টা ও যত্ন করিতে লাগিলেন। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য! তাঁহার এই অতি যত্নের—অতি সাধের "ভারতবর্ষ" প্রচারিত হইবার পূর্ব্বেই তিনি অনন্তধামে চলিয়া গেলেন। এখনও "ভারতবর্ষ" তাঁহার অমর নাম শীর্ষে ধরিয়া তাঁহারই আশীর্ব্বাদে সর্ব্বাঙ্গসুন্দররূপে বাহির হইতেছে। কিন্তু হায়! তিনি থাকিলে যে ইহা কিরূপ মনোহর ও উন্নত হইত তাহা কল্পনাও করা যায় না।

এইরূপে তিনি চাকুরী হইতে চিরবিদায় লইয়াও নানা প্রকারে মানসিক পরিশ্রম করিতে লাগিলেন। তখন যেন এই পরিশ্রমটা আরও বাড়িয়া গেল, কিন্তু শরীরে এত সহিল না।

সে দিন শনিবার, ১৩২০ সালের ৩রা জ্যৈষ্ঠ। দ্বিজেন্দ্রলাল বৈকালে তাঁহার শেষ নাটক "সিংহল বিজয়" খানা সংশোধন করিতে আরম্ভ করেন। নীচে তখন "ইভিনিং ক্লাবের" কয়েকজন সভ্য

খেলা করিতেছিলেন। বেলা ৫টার সময় তিনি "সিংহল বিজয়" সংশোধন করিতে করিতে পরিশ্রান্ত হইয়া যেমন আলস্য ভাঙ্গিলেন, অমনি বিকৃতস্বরে চাকরকে ডাক দিয়া মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। "ইভিনিং ক্লাবের" সভ্যগণ সেই স্বর শুনিয়া অমনি দৌড়িয়া আসিলেন। সেবা শুশ্রূষা ও চিকিৎসার একশেষ হইল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না।

রাত্রি ৯টা ১৫ মিনিটের সময়—একবার মাত্র জড়িতকণ্ঠে তাঁহার অতি আদরের একমাত্র পুত্র মণ্টুকে ডাক দিয়া তিনি চক্ষু মুদিলেন।

মহাকবি অনন্ত নিদ্রায় নিদ্রিত হইলেন!

---

[৯]

পিতামাতার সুসন্তান,—স্বদেশের একনিষ্ঠ সেবক স্বজাতির মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী দ্বিজেন্দ্রলাল চলিয়া গেলেন। সেই বাল্যে চপলতাহীন, যৌবনে সদা হাস্যময়, বার্দ্ধক্যে গম্ভীর দ্বিজেন্দ্রলাল আর এ জগতে নাই। পত্নী বিয়োগে তাঁহার হাসির গান স্তব্ধ হইয়াছিল—প্রৌঢ়ে সেই অমর লেখনী দেশের, জাতির ও সমাজের মঙ্গল চিন্তায় নিয়োজিত হইয়াছিল, প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়মে সেই লেখনী এবার চিরতরে স্তব্ধ হইল। দেশকে তিনি আর হাসির গান শুনাইবেন না—বাঙ্গালীর প্রাণে তিনি আর স্বদেশ ভক্তির প্রস্রবণ বহাইবেন না—তাঁহার মেঘমন্দ্র গান আর বঙ্গবাসীর দুর্ব্বল হৃদয় সঞ্জীবিত করিবে না। অকালে—মাত্র ৫০ বৎসর

বয়সে সেই মহাকবি চলিয়া গেলেন। হতভাগ্য বঙ্গের ভাগ্যে যেমনটী যায়, তেমনটি আর হয় না! এ অভাবও কি আর দূর হইবে! দ্বিজেন্দ্রের অন্তরঙ্গ বন্ধু পরম শ্রদ্ধেয় প্রসাদদাস গোস্বামী মহাশয় সত্যই বলিয়াছেন,—"আমাদের দ্বিজেন্দ্র গিয়াছে, সে দুঃখ আমাদের, আমাদের সঙ্গে তাহার অবসান হইবে; কিন্তু দেশের দ্বিজেন্দ্র গিয়াছে, সে দুঃখ দেশের, তাহার অবসান নাই।"

দ্বিজেন্দ্রের জীবন পূর্ব্বাপর আলোচনা করিলে দেখা যায়,—বন্ধু-বাৎসল্য, সরলতা, উদারতা, অমায়িকতা, সহৃদয়তা, শিশুর ন্যায় কাপট্যহীনতা, প্রভৃতি মহৎগুণে তাঁহার চরিত্র অতিশয় মনোহর—মধুময় হইয়াছিল। তাঁহার বন্ধুমাত্রই স্বীকার করেন যে, অনেকগুলি সদ্‌গুণে বিভূষিত থাকাতে তিনি একজন আদর্শ পুরুষ ছিলেন—যাঁহার অনুকরণ করিলে বঙ্গবাসী ধন্য হইবে—বঙ্গের গৃহে গৃহে শান্তি, প্রীতি, প্রেম বিরাজ করিবে। এই সকল সদ্‌গুণের সহিত অকপট সত্য-নিষ্ঠা মিলিত হইয়া তাঁহার জীবনকে আরও মহীয়ান্ করিয়াছিল। সত্যের জন্য তিনি কখনও মনভুলানো কথা বা কেবল মাত্র শুষ্ক বাহ্যিক শিষ্টাচার পছন্দ করিতেন না,—যাহা তিনি সত্য বলিয়া বোধ করিতেন, অকপটে মুখের উপর তাহাই বলিয়া দিতেন—তার জন্য কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ করিতেন না। এই অচপল সত্যপ্রিয়তা ছিল বলিয়াই আমরা দেখিতে পাই, তিনি যুক্তিতর্ক দ্বারা তন্ন তন্ন বিচার করিয়া যাহা সত্য বলিয়া ধরিতেন, কোন দিনও তিনি সেই মত ত্যাগ করিতেন না। সেই মতের জন্য হয়ত তাঁহাকে অনেক লাঞ্ছনা, অনেক দুর্ভোগ ভুগিতে হইত;—কিন্তু তিনি সর্ব্বদা অচল, অটল থাকিতেন।

প্রগাঢ় সত্যনিষ্ঠা এবং অবিচলিত স্পষ্টবাদিতা ছিল বলিয়াই তিনি যে সমাজে ও যে জাতিতে যে সকল জঘন্যতা বা দুর্ব্বলতা দেখিয়াছেন, তাহাই অসঙ্কুচিতচিত্তে কাহারও মতামতের প্রতি ভ্রূক্ষেপ মাত্র না করিয়া আক্রমণ করিয়াছেন এবং সকলের সম্মুখে তাহা উন্মুক্ত করিয়া দিয়া যেন বলিয়া দিয়াছেন,—সাবধান, এ সমাজে চলিতে হইলে, এ সমাজকে জীবনী-শক্তি দিতে হইলে, এই সকল জঘন্যতা, সঙ্কীর্ণতা, দুর্ব্বলতার হাত থেকে একে উদ্ধার কর ; তবেই ইহার রক্ষা। তিনি কোন জাতিকেই গুণের জন্য শতমুখে প্রশংসা করিতে এবং দোষের জন্য নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করিতে ক্ষান্ত হন নাই। এ বিষয়ে কোন জাতির বা সমাজেরই ভীতি-প্রদর্শন বা নাসিকা-কুঞ্চন তিনি গ্রাহ্য করিতেন না। তিনি ছিলেন সর্ব্বদা ন্যায় ও সত্যের পক্ষে—মিথ্যা বা অন্যায় ছিল তাঁর 'দু'চক্ষের বিষ'। সত্যের অনুরোধে—সমাজের কল্যাণ কামনায় তিনি নিজের প্রথম যৌবন কালীন ভুলভ্রান্তিগুলিরও নিষ্ঠুর সমালোচনা করিয়াছেন।

তারপর তাঁহার নৈতিক চরিত্র ছিল—নির্ম্মল অকলুষিত। বিলাতে শত প্রলোভনের মধ্যেও তিনি অবিকৃত অচঞ্চল ছিলেন। দেশে আসিয়াও যতদিন দেবী সুরবালা জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁহাকে প্রাণ দিয়া ভালবাসিয়াছেন। স্ত্রীবিয়োগের পর তাঁহার বিবাহ যোগ্য বয়স থাকিলেও—এবং যে বয়সে পুরুষ সর্ব্বদাই দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করিয়া থাকে—সে বয়সেও তিনি বিবাহ না করিয়া মৃতা পত্নীর স্মৃতি হৃদয়ে রাখিয়া জীবন কাটাইয়া গিয়াছেন। বঙ্গদেশে এরূপ দৃষ্টান্তও খুব বিরল। বস্তুতঃ তিনি পুনর্ব্বিবাহ সম্বন্ধে স্ত্রী পুরুষের

যে কোন পার্থক্য আছে, ইহা স্বীকার করিতেন না। তিনি নিজ জীবনেই তাহার উদাহরণও দেখাইয়া গিয়াছেন। বিপত্নীক অবস্থায়ও তাঁহার জীবন পূর্ব্বের মতই স্বচ্ছ—নিষ্কলঙ্ক ছিল।

দ্বিজেন্দ্রলাল চিরকাল স্ত্রীজাতিকে মাতৃরূপে দেখিয়াছেন। তিনি সর্ব্বদাই বলিতেন,—যেখানে স্ত্রীলোকদিগের পূজা নাই, স্ত্রীলোকগণ যে সমাজে অনাদৃত—উপেক্ষিত হইয়া থাকে, সে সমাজের উন্নতি সুদূরপরাহত। যে সমাজ এই মাতৃরূপিণী স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে কোনওরূপ বিকার আনিতে চেষ্টা করে, সে সমাজের মহা অনিষ্টকারী। স্ত্রীলোকে এই মাতৃত্ব বোধ ছিল বলিয়াই তিনি পতিতা নারীকেও কখন ঘৃণার চক্ষে দেখিতে পারেন নাই। তাঁহাদের জন্য তিনি গভীর অনুকম্পা পোষণ করিতেন।

দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবালাকে যেরূপ উজ্জ্বল চিত্রে চিত্রিত করিয়াছেন, এমনতর কেহ করিয়াছেন কি না সন্দেহ। দ্বিজেন্দ্রলাল বঙ্গবালার গুণগুলি উজ্জ্বলবর্ণে চিত্রিত করিয়া গাহিয়াছেন,—

"দিব্যগঠনা, লজ্জাভরণা, বিনত ভুবনবিজয়ী নয়না,
ধীরা, মলয় ধীরগমনা স্নেহ প্রীতিভরা রে।

* * * * * * *

পতিপ্রিয়া, পতিভকতা, সখী পতিসহ পরিহাসে,
দুঃখে দীনা, দাসী প্রেমিকা নীরবা নিঠুর ভাষে,
পীড়নে প্রিয়ভাষিণী, সহিষ্ণু সম এ ধরা রে;
দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী রে;

* * * * * * *

জীবপ্রেম ভরিত হৃদয়া, মেঘস্নিগ্ধশ্যামকায়া,
নিন্দি' তুহিনে শুভ্র চরিতে,—বঙ্গজ্যোৎস্না, বঙ্গজায়া,
কালো নয়নে, কালো চিকুরে, কালোরূপে অমরা রে।"

এহেন বঙ্গরমণীর পুণ্যবলের প্রভাব সম্বন্ধে দ্বিজেন্দ্রলাল বলিতেছেন,—"আমার বিশ্বাস যে, বাঙ্গালীর এ দুর্দ্দিনে যে এখনও মুখ তুলে চাইতে পাচ্ছে, তা' এই নারীজাতির ধর্ম্মের বলে।"

এই বাঙ্গালীর মেয়েকে যাতে নিরেট বাঙ্গালীর মেয়ে রাখা যায়, তারই চেষ্টা করিতে তিনি পুনঃ পুনঃ উপদেশ দিয়াছেন। তিনি "প্রায়শ্চিত্তে" দেখাইয়াছেন, বঙ্গবালাকে ইংরেজী ধরণে শিক্ষা দিলে তাহারা সাধারণতঃ কেমন বিগড়াইয়া যায়। তার উপর "বঙ্গনারীতে" সংস্কৃত শিক্ষিতা বিনোদিনীর ধৈর্য্য গাম্ভীর্য্যাদি মহৎ গুণাবলীর পার্শ্বেই বিনোদিনীর ভগ্নী ইংরেজী-শিক্ষিতা সুশীলার অসহিষ্ণুতা, অবাধ্যতা, ভাবপ্রবণতা, স্বাধীনতা প্রভৃতির ছবি আঁকিয়া তিনি স্পষ্টই দেখাইয়াছেন, কোন্ শিক্ষা এবং কি রকম ধরণের শিক্ষা আমাদের দেশের পক্ষে কল্যাণকরী। এই প্রসঙ্গে তিনি "বঙ্গনারীতে" সদানন্দ ও বিনয়ের কথোপকথনচ্ছলে বলিতেছেন,—"অবাধ্যতা ইংরেজী শিক্ষার একটা ফল। যদি বলা যায় বিলাতের মেয়েরা ত প্রায়শঃই শিক্ষিতা হইয়াও নম্র, তাহার উত্তর এই যে, "তারা পাঁচশত বৎসর ধরে শিক্ষা পেয়ে আস্‌ছে; শিক্ষাই যেন তাদের স্বাভাবিক অবস্থা। সকলেই দেখ্‌ছে যে অন্য সকলেই শিক্ষিতা। কারও গর্ব্ব কর্ব্বার কারণ বিশেষ কিছু নাই। তাই তারা

শিক্ষিতা হ'য়েও নম্র। এখানে বি, এ, পাশ কর্লেই মেয়েদের অহঙ্কারে মাটিতে পা পড়ে না।" কাজেই তিনি বলিতেন, মেয়েদের শিক্ষা দিতে হইবে, কিন্তু যাহাতে তাঁহারা সুশিক্ষা পায়—যাহাতে তাঁহারা অহঙ্কারী না হইয়া উঠে—যাহাতে তাঁহারা "দেবী, গৃহলক্ষ্মী, বঙ্গগরিমা, পুণ্যবতী, সাবিত্রী-সীতানুধায়িনী" হইতে পারে—যে শিক্ষায় তাঁহারা "বিশ্বপূজ্যা" হইয়া উঠে—সেইরূপ সুশিক্ষা তাঁহাদিগকে দিতে হইবে। তবেই বঙ্গের অন্তঃপুর বিমল জ্যোতিতে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠিবে—ঘরে ঘরে স্বর্গ সৃষ্ট হইবে। নচেৎ কুশিক্ষায়—যে শিক্ষায় শুধু বিলাসী করে—যে শিক্ষায় স্ত্রীজাতি-সুলভ সহিষ্ণুতা, ধৈর্য্য, বিনয়, লজ্জাশীলতা প্রভৃতি গুণাবলী নষ্ট হয়—সেইরূপ কুশিক্ষায় বঙ্গের অন্তঃপুর আস্তাকুঁড় হইবে। সংসার আস্তাকুঁড় করার চাইতে বরং মেয়েদিগকে শিক্ষিতা না করাও ভাল, ইহা তিনি "প্রায়শ্চিত্তে" দেখাইয়াছেন।

এই ত গেল মেয়েদের শিক্ষার কথা। তারপর ছেলেমেয়েদের বিবাহ এবং বিবাহে পণপ্রথা সম্বন্ধীয় তাঁহার মতামতগুলি আলোচনা করিলে দেখা যায়, তাহা কিরূপ যুক্তিপূর্ণ এবং সারগর্ভ। তিনি বলেন, পণপ্রথা উঠাইতে যাওয়া বিড়ম্বনা মাত্র। বিশেষতঃ সকল সভ্য-সমাজেই এই প্রথা রূপান্তরিত বা নামান্তরিত হইয়া কম বা বেশী মাত্রায় বিদ্যমান রহিয়াছে। আমাদের সমাজে টাকা নেয়, অন্য সমাজে হয়ত যৌতুক বা বিলাত যাওয়ার খরচ বা ঐরূপ অন্য কোন প্রকারে সেইটা পোষাইয়া নেয়। কাজেই এটাকে জোরজবরদস্তি করিয়া উঠাইতে গেলে, ইহা অন্য নামে অন্য ভাবে সমাজে দেখা দিবে এই মাত্র লাভ। "বঙ্গনারীতে" তিনি বলিতেছেন,—"ছেলের

ভরণপোষণ তুমি পঁচিশ বৎসর পর্য্যন্ত কর্বে, আর মেয়েদের দশ বৎসর না পেরোতেই যে ভরণপোষণের ভার বরপক্ষের উপর চাপিয়ে দেবে, বাকি পনর বৎসর ভরণপোষণের জন্য বরপক্ষকে কি কিছু দেবে না? তার উপর পুত্র হ'লেন তোমার যা কিছু সম্পত্তির উত্তরাধিকারী, আর মেয়ে কি ভেসে এসেছিল? কন্যার পিতারা চান কন্যাদের একেবারে ফাঁকি দিতে। সমাজ সে ফাঁকিটা দিতে দিচ্ছে না—এই তার অপরাধ।" এই অপরাধের জন্য সমাজের উপর রাগ করা বা সমাজকে দোষ দেওয়া অন্যায়। যদি বলা যায়—"আমি ত আমার সঙ্গতিমত আমার কন্যাকে যৌতুক দিতে অসম্মত নই। কিন্তু বরপক্ষ যে দেঁড়ে মুষে আদায় করে—ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিতে চায়।" "বরের পিতা দাবী করে কেন?" আমার যে কন্যাদায়—আমি ত ঠেকিয়া তার কাছে যাই,—সে আমার অবস্থার দিকে চায় না কেন? এর উত্তরে তিনি বলিতেছেন,—"যে বাপে ছেলের বিয়েতে টাকা নেয়, তারই আবার তার মেয়ের বিয়েতে টাকা দিতে হ'চ্ছে। হরেদরে পুষিয়ে যাচ্ছে। একথা ঠিক যে, যার মেয়ের সংখ্যা বেশী তার লোক্‌সান বেশী, আর যার ছেলের সংখ্যা বেশী তার লাভ বেশী। কিন্তু এরকম বৈষম্য ত পৃথিবীর সর্ব্বত্রই।" কাজেই "কন্যার বিবাহ দেওয়াই যদি অবশ্যকর্ত্তব্যের মধ্যে দাঁড়ায়, তবে যেখানে সস্তায় পাও সেখানে যাও না। তুমি বি, এ, পাশ করা এম, এ, পাশ করা ছেলে চাও—অর্থাৎ বরের ভাবী আয়ের দিকে তোমার বেশ্ লক্ষ্য"; আর বরের বাপের বুঝি টাকার দিকে লক্ষ্য থাকিতে পারে না। তোমার স্বার্থের দিকে তোমার বেশ্ লক্ষ্য

থাকিবে, অন্যে কেন তার স্বার্থ দেখে, তোমার দিকে চায় না—এটা বুঝি তার অপরাধ!

এই সমস্যার সমাধানচ্ছলে তিনি বলিতেছেন,—ছেলেমেয়েকে অল্প বয়সে বিবাহ করাইও না—"তারা সবল ও সমর্থ হ'বার পূর্ব্বে তাদের ঘাড়ে সংসারের ভার চাপিও না। তাহাদিগকে উপযুক্ত মত শিক্ষা দেও। অবশ্যই যদি "ভালো বরে বিবাহ দেবার সঙ্গতি থাকে, তবে বিবাহ দেও।" নচেৎ "ব্রহ্মচর্য্য শিখাও। বালবিধবারা যদি ব্রহ্মচর্য্য শিখ্‌তে পারে, বালিকা-কুমারীরা কেন না পার্ব্বে? আর এই কুমারীরা ব্রহ্মচর্য্য করিতে পারে না, এই যদি তোমার মত হয়, তবে বালবিধবারাও পারে না; তবে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত কর।" এবিষয়ে তিনি নিজের মতটা আরও স্পষ্ট করিয়া সদানন্দকে দিয়া বলাইতেছেন,—"আমার মত—যেখানে ভালো বরে বিবাহ দেবার সঙ্গতি আছে, সেখানে বালিকা-বিধবাই হউক, আর বালিকা-কুমারীই হউক, বিবাহ দেও। আর যেখানে আর্থিক অসামর্থ্য সেখানে ভিটেমাটি উচ্ছন্ন দিয়ে কারো বিবাহ দিও না। উভয়কেই ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেও।"

বিধবা-বিবাহের প্রসঙ্গে দ্বিজেন্দ্রলাল কেবল বালিকা বিধবাদের কথাই বলিতেছেন। নচেৎ পোষ্য সংখ্যা বাড়াবার জন্য সকল বিধবার বিবাহদেবার মত তিনি কখনও পোষণ করিতেন না। তবে বাল-বিধবাদেরও যে ব্রহ্মচর্য্য শিক্ষা দেওয়াই প্রশস্ত পন্থা এবং অতিশয় কর্ত্তব্য, ইহাই তাঁহার মত ছিল। যে স্থলে তাহা সম্ভব নয়, সে স্থলেই তিনি উপরোক্ত ব্যবস্থার কথা বলিয়াছেন। বিপত্নীকদিগের সম্বন্ধেও তিনি এই মতই পোষণ করিতেন।

মোট কথা, দ্বিজেন্দ্রলাল দেশকাল বিবেচনায় বাল্য-বিবাহের ঘোরতর বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে—"এই বাল্য-বিবাহ জাতটাকে যেমন মজ্জাভাবে দুর্ব্বল, অন্নাভাবে শীর্ণ, বলাভাবে ভীরু আর উদ্যমাভাবে অথর্ব্ব ক'রেছে, এমন আর কোন প্রথায় করে নি।

দ্বিজেন্দ্রলালের স্বজাতি ও স্বদেশপ্রীতি অপরিমেয়। স্বদেশের উন্নতিকল্পে, স্বজাতিকে আবার মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টায়, হিন্দুসমাজের সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলকামনায় এই স্বদেশমাতৃকার মহাসাধক তাঁহার জীবন পাত করিয়াছেন। তিনি দেশকে মাতৃস্বরূপা জ্ঞান করিতেন এবং যাহাতে এই দেশের শুভ হয়, যাতে এই দেশের সন্তানগণ জগতের সম্মুখে বুক উচ্চ করিয়া দাঁড়াইতে পারে—তাই ছিল তাঁর চেষ্টা—তাই ছিল তাঁর ধ্যান,—তাই ছিল তাঁর মহাব্রত। তাই ভারতমাতার নাম করিতেই তাঁহার কণ্ঠ ভক্তিতে উচ্ছ্বসিত, মহাসম্ভ্রমে কম্পিত হইয়াছে। তিনি একবার অগাধ ভক্তিভরে আবেগ বিকম্পিত কণ্ঠে গাহিয়াছেন,—

"ভারত আমার, ভারত আমার, যেখানে মানব মেলিল নেত্র;
মহিমার তুমি জন্মভূমি মা, এসিয়ার তুমি তীর্থ-ক্ষেত্র।
দিয়াছ মানবে জগজ্জননি, দর্শন উপনিষদে দীক্ষা;
দিয়াছ মানবে জ্ঞান ও শিল্প, কর্ম্ম ভক্তি ধর্ম্ম শিক্ষা।
ভারত আমার, ভারত আমার, কে বলে মা তুমি কৃপার পাত্রী?
কর্ম্ম-জ্ঞানের তুমি মা জননি, ধর্ম্ম-ধ্যানের তুমি মা ধাত্রী।"

সঙ্গে সঙ্গে অতীত স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃদয় গর্ব্বে পূর্ণ হইয়াছে এবং গর্ব্বভরে গাহিয়াছেন,—

"তাঁদের গরিমা স্মৃতির বর্ম্মে, চলে যাব শির করিয়া উচ্চ ;
যাঁদের গরিমাময় এ অতীত, তাঁরা ত কখনই নহে মা তুচ্ছ।

... .

যদি বা বিলয় পায় এ জগৎ, লুপ্ত হয় এ মানব-বংশ,
যাঁদের মহিমাময় এ অতীত, তাঁদের কখনও হ'বে না ধ্বংশ।"

গাহিতে গাহিতে তাঁহার প্রাণে নূতন আশা—নূতন ভরসা জাগিয়া উঠিয়াছে,—

"চোখের সাম্‌নে ধরিয়া রাখিয়া অতীতের সেই মহা আদর্শ ;
জাগিব নূতন ভাবের রাজ্যে, রচিব প্রেমের ভারতবর্ষ।
এ দেব ভূমির প্রতি তৃণ'পরে আছে বিধাতার করুণা দৃষ্টি,
এ মহা জাতির মাথার উপরে করে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি।"

তারপর "ভারতবর্ষের" উদ্বোধনে গাহিতেছেন,—

"যেদিন সুনীল জলধি হইতে উঠিলে জননি! ভারতবর্ষ!
উঠিল বিশ্বে সে কি কলরব, সে কি মা ভক্তি, সে কি মা হর্ষ!
সেদিন তোমার প্রভায় ধরার প্রভাত হইল গভীর রাত্রি
বন্দিল সবে "জয় মা জননি! জগত্তারিণি! জগদ্ধাত্রি!"
ধন্য হইল ধরণী তোমার চরণ কমল করিয়া স্পর্শ,
গাইল" 'জয় মা জগন্মোহিনি! জগজ্জননি! ভারতবর্ষ!"

আর কত উদাহরণ দিব। তাঁহার প্রত্যেক গানে, প্রতি নাটকে, প্রতি পদ্যে—জন্মভূমির প্রতি এইরূপ উচ্ছ্বাসময়ী ভক্তি জাতীয় উন্নতি

বিধানের তীব্র আকাঙ্ক্ষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ ভারতের কোন সন্তান এই রকম ভাষায়, এইরূপ আবেগে জন্মভূমির মহিমাগীতি গাহিয়াছেন কিনা জানি না।

তাঁহার এই স্বদেশ ভক্তি ছিল অনাবিল বাহ্যাড়ম্বর শূন্য। কার্য্যই ছিল এই ভক্তির প্রাণ। শুধু বক্তৃতা করিয়া স্বদেশ বা স্বজাতিকে উন্নত করা সুদূরপরাহত ইহাই ছিল তাঁহার বিশ্বাস। তাই তিনি বাঙ্গালীর এই অন্তঃসার শূন্য বক্তৃতা-প্রবৃত্তিকে নিন্দা করিয়া "আষাঢ়ের" 'কলিযজ্ঞে' লিখিয়াছেন,—"বাঙ্গালী বক্তৃতাজোরে করে রাজ্য চবৈতুহি।" কার্য্য না করিলে, ধর্ম্মের উপর জাতীয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা না করিলে ভারতের কল্যাণ নাই,—এই মত তিনি বরাবর পোষণ করিতেন।

আর এই স্বদেশ-প্রীতি তাঁহার রাজভক্তির অন্তরায় হয় নাই। ইংরেজের রাজত্ব যে আমাদের অশেষ কল্যাণের হেতু, ইহা তিনি সর্ব্বদাই স্বীকার করিতেন। স্বদেশের দৈন্য-দশা দেখিয়া যেমনি তিনি

"তুমি ত সেই তুমি ত মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা,
আমরা শুধুই হইয়াছি হীন, হারায়েছি সব বিভব-গরিমা।
তুমিত আছ মা তেমনি উচ্চ, আমরা শুধুই হ'য়েছি তুচ্ছ
তোমারি অঙ্কে লভিয়া জনম, জানি না কি পাপে এ তাপ সহি মা!"

বলিয়া আক্ষেপ করিয়াছেন, তেমনি শোকে তিনি সম্রাট্ সপ্তম এডোয়ার্ডের মৃত্যুতে

"গিয়াছে চলি' আজ বৃটন মহারাজ রাখি' এ বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব,
ধর্ম্ম কর আজ দুঃখ বেদনাই, কর্ম্ম কর আজ বন্ধ।"

বলিয়া কাঁদিয়াছেন। আবার তেম্‌নি আবেগে, তেম্‌নি পুলকে, তেম্‌নি রাজভক্তিতে মাতোয়ারা হইয়া

> "মানিয়া লইল শাসন যাঁহার অনার্য্য আর্য্য-সুত,
> স্থাপিল ভারতে গভীর শান্তি সাম্য মন্ত্রপূত,
> মুক্ত করিল স্বাধীন ধর্ম্ম স্বাধীন ধর্ম্ম-স্রোতে
> সে জাতির রাজা এসেছে ভারতে সুদূর বৃটন হ'তে।"

বলিয়া ভারতেশ্বরের ভারত আগমনে তাঁহাকে আবাহন করিয়াছেন। বস্তুতঃ রাজভক্তি ও স্বদেশ-প্রীতি তাঁহার জীবনে মন্দাকিনী-ধারা বহাইয়াছিল।

আমরা দ্বিজেন্দ্র-সাহিত্যকে তিন প্রধান ভাগে বিভক্ত দেখিয়াছি,—প্রথম জীবনে বিবাহের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত তিনি 'আর্য্যগাথা', 'একঘরে' এবং সাময়িক পত্রিকাদিতে প্রবন্ধাদি লিখিতেন। সেই বাল্যরচনায়ই তাঁহার ভাবী স্বদেশপ্রীতির এবং কবিত্বের ছায়াপাত হইয়াছিল। দ্বিতীয় বিবাহিত জীবনে রচনাগুলিতে তাঁহার হাসি যেন কুলে কুলে ছাপাইয়া উঠিয়াছে। সেই অমল হাসি তাঁহার কাব্য, প্রহসন এবং গানগুলিকে যেন একেবারে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছ। তারপর—পত্নীবিয়োগের পরবর্ত্তী জীবনে,—সেই হাসি অশ্রুতে পরিণত হইয়াছে, তখন তিনি মানব-চরিত্রে গভীর অন্তর্দৃষ্টি লাভ করিয়াছেন। এই সময়েই তাঁহার প্রধান প্রধান নাটকাবলী লিখিত হয়। সেই হাসি আর নাই—তাহার স্থানে আসিয়াছে গাম্ভীর্য্য—ক্রন্দন—সর্ব্বোপরি অকৃত্রিম স্বদেশ ও স্বজাতি-প্রীতি—"আবার তোরা মানুষ হ" বলিয়া

স্বদেশবাসীকে মানুষ করিবার চেষ্টা—সমাজের কল্যাণ-কামনা—পূত আশীর্ব্বাদ!

মহাপুরুষের সেই আশীর্ব্বাদ মস্তকে ধরিয়া তাঁহার অমর আত্মাকে তৃপ্ত করিবার জন্য—এস, আমরা সকলে আবার মানুষ হইতে চেষ্টা করি।

সম্পূর্ণ।